পঞ্চডিঙ্গি

পঞ্চডিঙ্গি

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

পঞ্চডিঙ্গি
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রকাশকাল: এপ্রিল-২০২৫
পঞ্চডিঙ্গি নামকরণে– কুইন ইউসুফজাই
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
কৃতজ্ঞতা: ডি.এ. তায়েব নায়ক
ও তাঁহার সহধর্মিণী মাহবুবা শাহরীন
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৮০৬-৪-৩

ISBN: 978-984-99806-4-3
Panchadingi by Azmir Rahman Khan Eusufzai, Panchadingi Name by Quin Eusufzai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: April-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

পঙ্গডিঙ্গি

ব্রিটিশ ভারতের শাসন আমলে বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থাৎ গ্রাম গঞ্জে এ চালা হতে অন্য চালাতে বর্ষা ভরা মৌসুমে চলাচলের জন্য একমাত্র নৌপথের বাহন ছিল ডিঙ্গি বা কেউ বলতো কুশা নাও বা নৌকা। তখন ডিঙ্গি নাও ছিলো জনপ্রিয়। সেই অর্থে এই বইতে নামকরণ করা হয়েছে 'পঞ্চডিঙ্গি'। যদিও বইয়ের পাঁচটি গল্পের সম্ভারে সম্পৃক্ত করে সাজানো হয়েছে। আশা করি বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে। আপনারা বইয়ের মূল লেখকের জন্য দোয়া করবেন যেন আপনাদের মাঝে নতুন গল্প বা উপন্যাস উপহার দিতে পারেন। সেই সাথে যাদের হাত দিয়ে 'পঞ্চডিঙ্গি' গল্প সম্ভার প্রকাশিত হচ্ছে ছায়ানীড়ের প্রত্যেককে এবং বিশেষ করে জনাব মো. লুৎফর রহমান, শাহানাজ রহমান এবং তারুণ্য তাওহীদের উপর চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদান্তে
কুইন ইউসুফজাই

উৎসর্গ

কন্যা গোধূলী রহমান খান ইউসুফজাই
জামাতা রাজিব ইকবাল

সূচি

শেফালীর আত্ম বলিদান
ও শেফালী দিদির সাথে পরিচয় ❑
নীলিমার নীল আকাশে ❑
অজ্ঞাত বসবাস ❑
নিঃসঙ্গ জীবনের পরিত্রাণ ❑
মা আমার পৃথিবী ❑

শেফালীর আত্ম বলিদান ও শেফালী দিদির সাথে পরিচয়

আমার বড় বোনের নাম ছিলো শেফালী। কেউ ডাকতো শেফি কেউ ডাকতো শিউলী। তার নামও যেমন ছিলো ফুলের নাম তেমনি দেখতেও শিউলী কিংবা শেফালী ফুলের মত গায়ের রং ছিলো ধবধবে। তাই বাবা মা হয়তো শখ করে শিউলী কিংবা শেফালী নামটি রেখেছিল। চুল ছিলো লম্বা বেণী ছেড়ে যখন থাকতো তখন মাটি ছুঁই ছুঁই আর চেয়ারে বসলে তো কোনো কথাই ছিলো না, একদম মাটির মেঝেতে চুলগুলি গড়াগড়ি করতো। তাই দেখে মা কতই না বকাঝকা করতো আর বলতো তোর কবে আক্কেল জ্ঞান হবে এতো সুন্দর চুল আর সেই চুল মাটিতে গড়াগড়ি করাচ্ছিস। আমার বোন শেফালী মায়ের কথায় হকচকিয়ে চেয়ার হতে উঠে দাঁড়াতেন তাই মা কখনও আপাকে মানে শেফালীকে বেনি ব্যতিত চলাফেরা করতে দিতেন না। এখানে যার কথা বলছি তার সাথে আমার বয়সের ফারাক বার বছরের। আমার বড় আপার বয়স ছিলো চৌদ্দ তখন আমার বয়স মাত্র চার। তাই একটু একটু মনে আছে। আসলে আমার জ্ঞান গরিমা সেই জন্ম লগন হতে প্রখর ছিলো যা মা বলতো আমার ছোট ছেলে যা একবার দেখতো তা অনায়াসে মনে রেখে গড় গড় করে বলে দিতে পারতো। আমারও তাই মনে হয় মা যে কথা বলতেন সত্যই। বাস্তব অর্থে এখনও নিজে নিজে নিজের আইকিউ লক্ষ্য করি যে যা দেখি তা স্পষ্ট মনে থাকে কোন কিছুই ভুলা যায় না, যা একবার দেখলে বা কানে শুনলে হলো। আমার যখন চার বছর বয়স তখন টাঙ্গাইল কালিহাতি অন্তর্গত ধলাপাড়া নামক স্থানে সুনাম ধন্য পরিবারের সন্তান ডাক্তার ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর সাথে আমার বড় বোন শেফালী আপার বিয়ে হয়। সুখে শান্তিতে ভালোই চলছিল আপার সংসার। আবার মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে নায়রে বা দাওয়াতে বেড়াতে আসতেন। যখন আসতেন তখন সাত গ্রামের লোক জানাজানি হতো। দুলাভাইসহ আপার থাকা হতো এক সপ্তাহ বড় জোর দশ দিন এর বেশি নয়। কারণ তখন একমাত্র যানবাহন হিসাবে পানসি নৌকা এবং শুকনার সময় ঘোড়ার গাড়ি বছরে দুই বার আসা হতো। শুকনার সময় যখন আসতো তখন মাঝে বিশ্রাম নিতে হবে। সেই সুবাদে আমার সেজো চাচা টাঙ্গাইল বসবাস করতেন চাকরি খাতিরে সেখানে এক রাত বিশ্রাম নিয়ে পুনর্বার আমাদের বাড়ি আসতেন। আসার সময় মনে হতো যা দেখতেন টাঙ্গাইল শহরে তৎসময়ে অর্থাৎ যা যা পাওয়া যেতো সব বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন পাড়া পড়শীদের জন্য কিনে নিয়ে আসতেন। খাদ্য খাবার থেকে সব, কখনো এখানে এসে দুলা ভাই বা আপা গরু বা ছাগল বা মুরগি বা মাছ তরকারি সহ মিঠাই মণ্ডা কিনতেন আবার কখনো তিনার আসার দুই/তিন দিন আগে ওসব গরুর গাড়ি করে বা মহিষের গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিয়ে তারপর তিনারা আসতেন। সেই সব আনন্দের দিনের কথা ভোলা যায় না। সে কি আনন্দ হতো! যতদিন থাকতেন। যেমন ওয়াজ মাহফিল, গান বাজনা, লাঠিখেলা, নৌকা বাইচ, মঞ্চ নাটক, জারি সারি, যাত্রাপালা আরও কি সব ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠান হতো তবে আমি তখন ছোট থাকায় ততটা বুঝতাম না। আমার আপন বড় ভাই, বোন এবং চাচাতো ভাই বোন আরও আত্মীয় তখন যারা থাকতেন তার সাথে পাড়া পড়শী যা উপস্থিত থাকতো কি যে মজা হতো ভাষাতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজ আর সচরাচর চর্চা নেই সেই সব দিন কালের বিবর্তনে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। আমার বড় বোন বছরে দুবার বাধাধরা নিয়মে আর যদি বাবা মা ভাই বোন অসুস্থতায় লিপ্ত বা বিশেষ কোন প্রয়োজন হলে আসা হতো। এভাবে চার পাঁচ বছর আসা যাওয়া হলো স্বামীর গৃহ ধলাপাড়া হতে পাকুল্যায় বাবা মার গৃহে। একদিন পৃথিবীর সকল আলো বাতাস বন্ধ হয়ে নেমে এলো অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার, এলো ঝড় বৃষ্টি তুফান। শুরু হলো হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বৃদ্ধ আবাল বণিতার কান্নার সুর। মনে হয়েছে সমস্ত আকাশ ভেঙে মাটিতে নুইয়ে পড়লো। সে এক হৃদয় বিদারক কাহিনি। ঝরে পড়লো শিউলি কিংবা শেফালী ফুল, নিভে গেলো চিরতরে তরতাজা প্রাণ স্পিরিটের আগুনে দগ্ধ হয়ে। সেদিন আমার বড় বোন কাক ডাকা ভোর হবার আগেই ঘুম হতে উঠে আযানের পরপর শাশুড়ির অযুর পানি দিয়ে নিজে অজু করে নামাজ আদায়ের পর কুরআন তেলাওয়াত শেষে দৈনন্দিন যথাযথ রুটিন অনুযায়ী উনুন জ্বালিয়ে প্রথমত শাশুড়ি ও স্বামীকে নাস্তা তৈয়ার করে খাবার দেওয়ার পরে নিজে খেয়ে বাড়ির কাজের লোক এলে তাদের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া পরে বেলা বাড়ার সাথে সাথে শাশুড়িকে রোদে বসিয়ে মাথাতে তেল দেওয়া তারপর তার পানি রোদে গরম করে সেই পানি দিয়ে শাশুড়িকে গোছল করিয়ে দেওয়া এবং নিজেও গোছল করে পরিপাটি হয়ে পুনর্বার দুপুরে রান্না করা। ঘটনার দিন দুপুরে অবশ্য বড় আপার স্বামী খেতে এসেছিলেন সেদিন বাড়ির চাকর দিয়ে চেম্বারে খাবার পাঠানো হয় নাই। ডাক্তার ওয়াজেদ আলী সেদিন আসার সময় একটি স্পিরিট সহ টিনের বাড্ডি এনেছিলো তা আবার চাকর মুক্তারকে রাখার জন্য বলে। মুক্তার স্পিরিটের টিনের বাডটা যে ঘরে বড় আপার শাশুড়ি মা থাকে সেই

ঘরের দরজার আড়ালে রেখে আসে। কিন্তু মুক্তা বড় আপুর স্বামী কাউকে জানায়নি। ডাক্তার ওয়াজেদ আলী দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে একটু রেস্ট নিয়ে আপার সাথে সাংসারিক আলাপ আলোচনা করে আবার বিকেল বেলায় মুক্তারকে নিয়ে চেম্বারে চলে যায় কিন্তু যাবার সময় ঐ দরজার আড়ালে রাখা স্পিরিটের বান্ডটা চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার কথা মুক্তারের মনে ছিলো না। ফলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্তে আসিয়ার মাকে দিয়ে প্রত্যেক ঘরের জন্য হারিকেন পরিষ্কার করে কেরোসিন তেল ভরে যার যার ঘরে রেখে যায়। শাশুড়ির ঘরেরটা শাশুড়ির ঘরে, আপার ঘরেরটা বড় আপার ঘরে মুক্তার এবং আসিয়ার মার ঘরেরটা আসিয়ার মা নিয়া রেখে আসে। সন্ধ্যা লাগে লাগে মসজিদে আযান হওয়ার আগেই যার যার ঘরের হারিকেন জ্বালিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নেয়। তদানুযায়ী সেদিনও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। তবে সন্ধ্যা লাগে লাগে অবস্থা বড় আপা শাশুড়িকে অযুর পানি দিয়ে যায় এবং শাশুড়ি বারান্দাতে এসে অযু সম্পন্ন করে ঘরের ভিতরে গিয়ে হারিকেন জ্বালিয়ে ম্যাচের কাঠি ব্যবহার করে সেই ম্যাচের কাঠিটি নিত্যদিনের অভ্যাস ঘরের কোণে ফেলে দিতেন। সেদিন সেই কাজটি করেছিলেন বড় আপার শাশুড়ি তবে আসিয়া বলেছিলো দাদি আম্মা আপনার হারিকেন পৈলতা আমি ধরিয়ে রেখে যাই কিন্তু প্রতিদিন তার এই কাজটা করেন বিধায় তিনি না বলে চলে যেতে বলেন এবং দাদি আম্মার কথাখানা আমার বড় আপুর কাছে বলেছিলেন। আপা আসবে বলে আযান দেওয়ায় আসিয়াকে বলে ঠিক আছে তুই গিয়ে তোর মাকে বল উনুন জ্বালিয়ে রাতে ভাত বসাতে এবং সমস্ত রান্না করা তরকারি মাছ গরম করে মিরছোপে তুলে রাখতে আর এর ফাকে শাশুড়ি আর আমাকে চা তৈয়ার করে দিয়ে ফ্লাস্কে রাখ যাতে নামাজ হলেই বৌ শাশুড়ি খেতে পারি। তোদের জন্য চা করিস, আসিয়া আবার চা না খেলে তা ঘুম হয় না। এই বলে নামাজের পাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং শাশুড়ি ঘরের হারিকেনের পৈলতা ম্যাচের কাঠি দিয়ে জ্বালিয়ে আগুনসহ জ্বলন্ত কাঠিটি দরজার আড়ালে নিক্ষেপ করলে কাটিখানা স্পিরিটের টিনের বান্ডিতে পরে আস্তে আস্তে স্পিরিটে আগুনে সংযোগ ঘটার আগে শাশুড়ি মা ঐ নিকটে থাকা জলচৌকিতে উঠে মাগরিরের নামাজ আদায়ে পর্যায়ে এক রুকু বা সেজদা দিতে না দিতেই স্পিরিটে বান্ডিটা বিকট শব্দে ব্রাস্ট হয়। বড় আপা ফরজ আদায়ের শেষে ছালাম ফিরাতে না ফিরাতে রেখে তার শাশুড়ির ঘরে তীব্র আগুনের লেলিহান, আসিয়া, আসিয়ার মা আপাকে না করা সত্ত্বেও আপা দৌড়ে গিয়ে শাশুড়ির পিঠে আগুন লেগে শাড়ি পুড়ছিল তাই দেখে তা নিভাতে গিয়ে কখন যে তার শুতির শাড়ির আঁচলে আগুন লেগে গেছে তা তিনি টের পান নাই। এর মধ্যে আসিয়ার মা চিৎকার চেচামেচি করে আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে আমার দাদিজান, আম্মাকে বাঁচাও। নিজের শাশুড়িকে ঘরে এক কোণে নিরাপদ স্থানে পাটের ছালা, চট দিয়ে মুড়িয়ে রেখে ভিতর হতে আগুন নিভানোর চেষ্টা করে আর বাহির হতে পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন এসে পানির বালতি মেরে মেরে আগুন নেভানোর এক পর্যায়ে স্পিরিটে বাভটি নেওয়ার জন্য মুক্তার এসে দেখে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে মুক্তার হায়রে করে চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হওয়ার মুহূর্তে বলে আমি ঘর মানুষ পুড়িয়ে দিলাম আমার দোষে এমনটি হলো। তৎক্ষণে আগুন গ্রামবাসী নিভিয়ে ফেলেছে। কিন্তু নিভাতে পারে নাই আমার বড় আপার শাড়ির আঁচলে লাগা আগুন। তিনি পুড়ে পুড়ে কঙ্কাল হয়েছিলেন তবুও মায়ের মর্যাদার শাশুড়িকে তার সম্ভ্রম সহ পুড়ে যাওয়া শরীর রক্ষা করতে পেরেছিলো। স্বামী এসে তার স্ত্রীকে মৃত কঙ্কাল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটে পড়লেন। আর স্বামীর মাকে পাড়াপড়শী ঘর হতে বাহির করে আমার বড় আপা যে ঘরে স্বামীকে নিয়ে থাকতেন সেই ঘরে সেবা যত্ন করলেন। আর আগুনে কঙ্কাল হওয়া নিথর দেহ পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজনরা সাদা ধবধবে শাড়ি দিয়ে ঢেকে রাখলেন। এই সংবাদ কালিহাতির থানার মাধ্যমে আমাদের মির্জাপুর থানাতে জানিয়ে দিলে থানা হতে লোক পাঠিয়ে আমার বাবা-মাকে আমাদেরকে জানালে ঐ রাতের অন্ধকারে আমরা ছুটে যাই ধলাপাড়াতে। তখন যাওয়ার ব্যবস্থা সহজ লভ্য ছিলো না। তখন একমাত্র মাধ্যম ঘোড়ার গাড়ি। মহিষের বা গরুর গাড়ি আর বর্ষা মৌসুমে পানসি নৌকা বা ডিঙ্গি নৌকা। এইভাবে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বিকেল আনুমানিক দুই তিনটা হবে। বাবা-মার সাথে আমি আমার মেজো ভাই, মেজো বোন, ছোট বোন বড় আপার বাড়ি উপস্থিত হলে কান্নার রোল পড়ে যায়। আমার বাবা মা ভাই বোনের সে কি কান্না এদের সাথে বড় আপার স্বামী এবং বাড়ির লোক জন পাড়া পড়শীরাও কাঁদছিলো। কারণ পাড়াপড়শী স্বামীর আত্মীয় স্বজন আপাকে ধলাপাড়া এলাকাতে সকলেই এতটা শ্রদ্ধা স্নেহ ভালোবাসতেন যে কোন মহিয়সী পুত্রবধূকে এতটা ভালোবাসতেন না। কারণ আপা ধলাপাড়ার এলাকাতে একজন দানশীল, মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে সর্বদাই স্নেহময়ী মা, ভাবী, আপা, আর কারো কারো কাছে শেফালী শিউলি আবার শেফী। তার শাশুড়ি বৌ বলতে অন্ধ ছিলেন। একটু চোখের আড়াল হলে বৌ রানীমা বৌ রানী মা করে মাথায় তুলতেন। বলতেন দেখতো আসিয়ার মা আসিয়া আসিয়া বৌ মা আমার কোথায় গেলো। আসিয়ার মা বলতো আপনার বৌ রানী মা কি শুধু সারাক্ষণ আপনার সেবা যত্ন নিয়ে পড়ে থাকবে তার কি একটু

বিশ্রাম নাই তার কি কারো সাথে কারো ঘরে বসে দুই একটি কথা বলতে ইচ্ছা হয় না।

শাশুড়ি বলতেন বৌ রানী মা আমাকে সাথে করে নিয়ে গেলেই তো পারে তবে আর ডাকাডাকি করতে হয় না। আসিয়ার মা বলতো, আম্মাজান যে কি বলেন। সত্তর বছরের বুড়িকে নিয়ে আঠার বছরের বৌ যাবে নাকি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে। আরে আম্মা যুবতি মেয়ে ছাওয়াল গো কি কথা সত্তর বছরের বুড়ির সামনে আলাপ করা যায় বা করবে। তাদের বয়সী মেয়েদের সাথে কত রকম কথা থাকতে পারে। এমন সময় বড় আপা শাশুড়ির সামনে এসে দাঁড়ালে শাশুড়ি হাসি দিয়ে, 'কি গো বৌ রানী মা আমাকে একা ফেলে কোথায় গিয়েছিলে।' তখন আমার বড় আপা বলতেন, 'আর বলবেন না আম্মা আমাদের পাশের বাড়ির মর্জিনা ভাবীর বাচ্চা প্রসব হবে তার নাকি মাঝে মাঝে তলপেটে ব্যথা হচ্ছে। তাই শুনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আম্মা গিয়ে দেখলাম মর্জিনা ভাবীর অতিরিক্ত নড়াচড়ার কারণে বাচ্চা সামান্য নিচে পড়ে গিয়েছিল আমি তাই তুলে দিয়ে এলাম। বাচ্চা তল পেটের উপরে তুলে দিতেই ব্যথা কমে গেছে। তবে মর্জিনা ভাবীর বাচ্চা হওয়ার সময় আরও বেশ কদিন বাকী আছে। বৌয়ের কথা শুনে, 'তা বেশ ভালো করেছো। জানো বৌ রানী মা এই জন্য আমার ওয়াজেদকে ডাক্তারী লাইনে পড়ালেখা করিয়েছি। তুমি তো ওয়াজেদের সাথে লন্ডনে গিয়ে প্রায় দেড় বছর ছিলে। তোমাকে ওয়াজেদের সাথে পাঠিয়ে আমার যে কি কত শূন্যতায় কেটেছে দিন রাত্রি ভাষায় বলতে পারবো না।' শাশুড়ির কথার উত্তরে বৌ শেফালী মানে আমার বড় আপা বললেন, 'তাইতো বিদেশে এতো সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আপনার জন্য আপনার ছেলে আর আমি আপনাকে নিয়ে এই অজপাড়া গাঁয়ে থেকে গেলাম, কারণ আপনি তো আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। 'সেই জন্য তো বলি তুমি আমার বৌ নয় আমার মেয়ে আমার লক্ষ্মী রানী।' বৌ রানী শাশুড়ির ডাকের উত্তরে– তা কি জন্য আমাকে কেন ডাকছিলেন। না এমনি তোমাকে দেখছিলাম না তো তাই। বৌ শাশুড়ি ঠিক এমনি মধুর সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলো। সেই জন্য তো নিজের দিকে না তাকিয়ে শাশুড়িকে বাঁচানোর জন্য আত্মবলিদান দিলেন পুড়ে ছাই কঙ্কাল হয়ে। বলা দরকার যে আসিয়ার মা সর্বক্ষণ বড় আপার পাশে পাশে বিচরণ করতো। এতটাই মহব্বত ভালো বাসতো আপা আর আসিয়ার মাও। এলাকার কে না ভালোবাসতো। যখন আপার কবর খোড়া হলো তার আগে আসরের পর আপার জানাজার নামাজ হলো মনে হয়েছিলো পূর্বে ধলাপাড়াসহ আশেপাশের লক্ষ মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। দেখে মনে হয়েছিলো ওরা এদের মাঝখান হতে কাকে হারাতে যাচ্ছে না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে। বড় বোনকে হারাবার শোকে ভাই বোন বাবা মার কান্নার আওয়াজ যেন থামতেই চাইছে না। যেন আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে সাগরে জলোচ্ছ্বাস ঢেউগুলি এলোমেলো হয়ে আচড়ে পড়ছে কূলের কিনারায় ভেঙেচুরে নিয়ে যাচ্ছে মাটির গহ্বর তলে টেনে। এমনি অবস্থা মেয়ে হারা বাবা মায়ের কান্না যেমন থামছে না তেমনি ভাই বোনের। কি সুন্দর মুখ ছিল আমার বোনের উচ্চতাও কম ছিলো না প্রায় ৫ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা। জ্ঞানে বুদ্ধিতে কাজে কর্মে যেমন বাবা, মার পরিবারে ছিলেন তেমনি শ্বশুর বা স্বামীর বাড়ির পরিবারেও।

বড় আপা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নিজ নিবাস পাকুল্যা চৌধুরী বাড়িতে। তখন অবশ্য দাদী রহিমুন নেছা চৌধুরী রানী জীবিত ছিলেন এবং তারই কোলে পিঠে মানুষ। আচার আচরণ জ্ঞান গরিমায় এবং উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত ডাক্তারী পড়ার মাঝে স্বামীর সাথে লন্ডন চলে যান। তার মানুষের প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা শ্রদ্ধা ছিলো অগাধ। শুনেছি কখনো নাকি কারও সাথে মুখ কালো করে বা রাগত্ব স্বরে কথা বলতেন না। নম্র ভদ্র একজন মাটির মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের পড়ালেখা শেষ করে বাবা মাকে কাজে সহযোগিতা করতেন সদা সর্বদা। বড় আপা শিউলী শেফালী, বেলি, কামেনী, হাসনাহেনা, গন্ধরাজ, ফুল ভালোবাসতেন বলে বাবা এই সব ফুলের গাছগুলি রোপণ করে দিয়েছিলেন। কালের বা সময়ের বিবর্তনে সেই সব গাছ না থাকলেও আজও নতুন ভাবে তার স্মৃতির চিহ্ন হিসাবে পুনরায় রোপণ করা হয়েছে। ঠিক তদরূপ তাকে যে জায়গাতে কবর দেয়া হয়েছে তারই রোপণ করা ঐ সকল ফুল তাছাড়া বাতাবী লেবু, কৃষ্ণচূড়া, বকুল, আম, জামের সমারোহে ভরপুর তারই ছায়াতলে চির নিদ্রায় শায়িত করা হয়। কালের সাক্ষী হিসাবে সেই ফুল ও ফলের গাছগুলি তার স্বামীর বাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। আজ প্রায় কত যুগ পার হয়ে গেছে তার মৃত্যুর তারিখ দিনক্ষণ শুধু রয়ে গেছে স্মৃতির পাতায়, মনে পড়লেই চোখে জল আসে। বড় আপার এই অকাল মৃত্যুর এবং তাকে হারাবার পর বাবা মা প্রায় পাগলের মত হয়েছিলেন বেশ কিছুদিন তাই তার স্মৃতি বহন করার লক্ষ্যে বাড়ির সামনে শেফালী লজ নামটি খোদাই করে রেখেছিলো কিন্তু এক সময় পুরাতন দেওয়াল হওয়ায় ভেঙে পড়ে আর তা কোনোদিন পুনঃস্থাপন করা হয়নি। এদিকে প্রথমে মা দুনিয়া হতে বিদায় নিলে পরে বাবাও একদিন চলে গেলো। এদিকে ভাই বোনের মধ্যে শেফালী মানে বড় আপাকে সবচেয়ে যে বেশি স্নেহ ভালোবাসতেন তারই বড় ভাই ছায়েদুর রহমান খান ইউসুফজাই (শাজাহান খান) পিঠাপিঠি বোনকে দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার কথা শুনে সেও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন বেশ

কিছুদিন। চাকরি বাকরী বাদ দিয়ে একাকি কাটিয়েছিলেন কয়েক মাস। আর আমাদের কাছে ছিলো শেফালী বড় আপা শ্রদ্ধার পাত্র। আমার মেজো ভাই মসিউর রহমান খান ইউসুফজাই (সেলু) এক সময় টাঙ্গাইলের মধ্যে তুখোড় ফুটবল প্লেয়ার বলে বড় আপা তাকে সমস্ত খেলার সরঞ্জাম কিনে দিয়ে বলেছিলেন, আরও ভালো খেলতে হবে বাবার মত নাম ডাক হতে চাই। অবশ্য বলা হয় নাই আমার বাবা হাবিবুর রহমান খান ইউসুফজাই ওরফে হবি মিয়া একজন কলকাতা মহনবাগানের নামকরা বেগি ফুটবলার ছিলো তার একটা কিকে মাঠের এ পার হতে ওপারে চলে যেতো। তাই বড় আপা খেলাকে পছন্দ করতেন বলে আরও ভালো খেলার জন্য তাগিদ দিতেন। অবশ্য আমার খেলাধুলা বড় আপা দেখে যেতে পারেন নাই। কারণ আমি বড় হবার বা এডিভিশনে খেলার আগেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আগুনে দগ্ধ হয়ে। আমার বড় আপার মৃত্যুর প্রায় এক দেড় বছরের মধ্যে আপার স্বামী ডাক্তার ওয়াজেদ আলী চৌধুরী দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় রাজাকারের হাতে বন্দি হন। তারপর তাকে অবশ্য রাজাকারগণ ধলাপাড়া বিলের পারে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে রেখে যায়।

উপরোক্ত বক্তব্য ব্যক্ত করা যে কারণে। হঠাৎ সুদীর্ঘ ৮৫ বছর বয়সের শেফালী নামের এক দিদির সাথে ছায়ানীড়ের অধ্যাপক লুৎফর রহমান সাহেবের সুবাদে ছায়ানীড় পল্লীতে পরিচয় হয়। যখন আমার সাথে লুৎফর সাহেব শেফালী দিদিকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন তার বয়স প্রায় ৮৫ বৎসর মানে আমার বড় আপা বেঁচে থাকলে তার মতই বয়স হতো। আমার বড় আপার জন্ম ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে আর শেফালী দিদির জন্মও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। শেফালীর নাম লুৎফর সাহেবের মুখে উচ্চারণ করার সাথে সাথে সেই সুদীর্ঘকালের সমস্ত কথা শেফালী দিদির সাথে আদান প্রদান হলো, দিদির মুখ খানা দেখে সেই বড় বোনের প্রতিচ্ছবি চোখে মুখে ভেসে উঠলো। মনে হলো নিমিষে পা জড়িয়ে বলি, 'তুমিই আমার হারিয়ে যাওয়া সেই শেফালী আপা।' আসলে দিদির সাথে বেশ কদিন চলাফেরায় দিদিও আমাকে আপন ভাই হিসাবে আপন করে নিয়েছে আর আমি তার ব্যতিক্রম করিনি। হয়তো কালের বিবর্তনে কেউ না কেউ এসে তারই অনুকরণীয় ব্যক্তি স্থান দখল করে নেয়। এখন দিদিকে কয়েকদিন না দেখতে পেলে মনের ভিতরটায় বোনের অভাব অনুভব করে থাকি। তাই মাঝে মধ্যে তার কাছে যেতে না পেরে মোবাইলের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে থাকে। অনেক কথা হয় ভাই বোনের। শেফালী দিদি ছায়ানীড়ের প্রকাশনায় বেশ কয়েকটি উপন্যাস, কবিতার বই বেরিয়েছে এবং আমারও বেশ কটা বই বেরিয়েছে ফলে এ বছরের উপন্যাস একুশে বইমেলা ২০২৫ বই মেলায় স্থান পেয়েছিলো। দিদির বাইরে আমি আরেক জনকে আমার আপন বোনের মর্যাদাতে হৃদয়ে ঠাঁই দিয়েছি। তিনি লুৎফর রহমানের গৃহিণী এবং ছায়ানীড়ের প্রশাসনিক বিভাগের পরিচালক শাহানাজ রহমানকে আসলে স্নেহ মায়া মমতা ভালোবাসা শ্রদ্ধা কখনো অর্থের মানদণ্ডে বিচার হয় না বা অর্থ দিয়ে কেনাবেচা হয় না, হয় উদার উন্মুখ আচরণের সম্পর্কের কারণে। যে কথা বলছিলাম আমার বড় আপা উচ্চতা চলনে বলনে কথা বার্তায় শেফালী দিদির মত একই শুধুমাত্র গায়ের রঙের পার্থক্য কিছুটা তারতম্য। শেফালী দিদি যেমন মানুষ পেলে প্রাণ খুলে নিজের আত্মা ঢেলে আন্তরিকতার সহিত আপন করে নেয় ঠিক অনুরূপ বড় আপাকেও দেখেছি। তাই এখন অনেক সময় ভাবি কেন শেফালী দিদির সাথে আগে আমার পরিচয় হয় নাই। তাহলে তো বড় বোনের আদর পেতাম। আসলে এটাও ভাবা উচিত যখন যা হবার তখন সেটাই হয়ে থাকে। যত কথাই বলি না কেন তবুও মনে মনে একটু হলেও আক্ষেপ থেকে যায়। অনেক সময় মানুষের হাতের নাগালে থাকলেও যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক তেমনি আবার দূরে থাকলেও হাতের নাগালে সহসাই পাওয়া যায়। সবই বিধাতার ইশারা বা লিখন। শেফালী দিদি বিন্দুবাসিনী গার্লস হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে ছিলেন। আমার ছোট বোন বেবী ঐ স্কুল হতে ম্যাট্রিকুলেট পরীক্ষা দিয়েছিলো। এখনও আমার মনে আছে আমি এবং আমার খালাতো ভাই সাদু সেই পরীক্ষা দেখার জন্য এই প্রথম বিন্দুবাসিনী কম্পাউন্ডে গিয়েছিলাম। সেদিন নকল ধরার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ আর্মি টহলে ছিলেন তা এক পর্যায়ে তাহাদের ধাওয়া খেয়ে তাদের কবলে পড়ে দৌড়াতে গিয়ে বরই কাঁটা ফুটে রক্তাক্ত হলে কোন ভাবে আমার খালাতো ভাই সাদু আমাকে ধরে বাসাতে নিয়ে আসে। একথা মনে হলে আজও হাসি পায়। কেন তা মনে হলো এক শেফালী দিদির সাথে পরিচয় আর সম্পর্কের কারণে। আর অন্যদিকে স্মৃতির অন্তরালে মনের ভেতর হতে নড়াচড়া খেলায় এক পলকে দোলনার মত দোল খেলে গেলো। অথচ আজ এমনি সময় পরিচয় হলো যে দিদি কখনও কখনও অসুস্থ হয়ে পরে, শুধুমাত্র মনের জোরে এতো বয়স হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার লাঠি ভর ব্যতিরেকে কারও সাহায্য ছাড়া চলতে ফিরতে নিজের কাজ নিজেই করতে পারেন। যদি উনার গালে টিউমার না হতো না হতো অপারেশন তবে আমার মনে হয় বর্তমানে যে অবস্থাতে আছেন তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি ভালো থাকতেন। দিদির গলাতে টিউমার অপারেশন করতে গিয়ে এক পর্যায়ে প্রায় মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করেছে কিন্তু

বিধাতার অসীম আশীর্বাদে দীর্ঘ দিন হসপিটালে অবস্থানের পর উন্নত চিকিৎসার জন্য সুস্থ অবস্থাতে ফিরে আসতে পেরেছেন। অপারেশনটি হয়েছিলো কলকাতা কোন এক হসপিটালে। তাই বলি তবুও যে দিদিকে দেখতে পাচ্ছি পরিচয়ের মাধ্যমে, সেজন্য বিধাতার কাছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া জানাইতেছি। তবে দিদিকে প্রায় প্রায় মানে দেখা হলেই প্রশ্ন করি যে দিদি বর্তমান যুগ তার আপনি লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ত তাছাড়া ডিজিটাল যুগ, এ যুগে স্মার্ট মোবাইল না হলে চলে কথা বললেই দিদির মুখখানা ভারাক্রান্ত হয়ে আসে কিন্তু আমার কথার কোন উত্তর পায় নাই। হয়তো আমার প্রশ্নে উত্তর দিতে চাই না। তবে একদিন মন স্থির করলাম দিদি হতে আমার জানতে হবে দিদি কেন স্মার্ট মোবাইল ব্যবহার করে না। একদিন দিদি হতে মওকা পেয়ে গেলাম এবং পুনর্বার জানতে চাইলাম যে দিদি আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না আজ বলতেই হবে কেন ডিজিটাল স্মার্ট মোবাইল ব্যবহার করেন না তখন দিদি অপারগ হয়ে বলতেই চোখের কোণে ভিজে টপটপ করে জল গড়িয়ে মাটিতে পড়তে লাগলো। সেই কান্না ভেজা চোখে, শোন আমি কেন স্মার্ট মোবাইল ব্যবহার করি না তার কারণ তোমার জামাই বাবু বলেছিলো আমরা একত্রে দুইটি স্মার্ট মোবাইল ক্রয় করবো। কিন্তু তোমার জামাই বাবু তারপর মাস তিনের মধ্যে পরবাসে স্থানান্তর হলেন সেই পর আজও স্মার্ট মোবাইল খরিদ করা হয়ে উঠে নাই। দিদি কথাগুলি ব্যক্ত করতে গিয়ে চাপা কান্নায় নাক মুখ ভিজিয়ে দিলেন। এর হতে প্রমাণ হলো যে দুজনে দুজনকে কত ভালোই না বাসতেন। দিদির মুখে আরও শুনতে পেলাম, জামাই বাবু আর দিদি নাকি একে অপরকে ছেড়ে অন্ততপক্ষে দিনে যেমন তেমন রাত্রিতে একত্রে না খাওয়া দাওয়া হলে না কি ঘুমই হতো না দুজনের। কারণ ভোর সকালে জামাই বাবু তার কর্মস্থল মির্জাপুর হসপিটালে চলে আসতেন আর দিদি চলে যেতেন তার কর্মস্থল বিন্দুবাসিনী গার্লস হাই স্কুলে। সেই কারণে রুটিন মোতাবেক উভয়ে রাতে দেখা সাক্ষাত কথা বলা মান অভিমান হলে উভয়ের মধ্যে ভাঙিয়ে নেওয়া আবার একত্রে খাওয়া দাওয়া ঘুমানো এবং দৈনন্দিন কাজে সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত দুজন দুই মেরুতে কাজের জন্য থাকা। শুধু দিদির জীবনে নয় অনেক পরিবার আছে ঠিক শেফালী দিদি এবং জামাই বাবুর মত পথ পরিক্রান্ত করে এগিয়ে যেতে হয়। তবে একই কথা সংসারে ভালোবাসা স্নেহ মায়া মমতা শ্রদ্ধা থাকতে হবে তাহলে না যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনের সার্থক। তাই দিদিকে আমার ভালো লাগে বিধায় বড় বোন শেফালীর আসনে আরেক শেফালী দিদিকে মনে প্রাণে স্থান দিয়েছি। বর্তমানে শেফালী দিদিকে আরও দীর্ঘায়ু দিয়ে আমাদের মাঝে রাখুন এই প্রত্যাশা বিধাতার কাছে। তার সাথে আমার ছোট বোন শাহনাজ রহমানকেও দোয়া করি ও যেন সর্বদাই ভালো থাকে।

নীলিমার নীল আকাশ

একটি আট বছরের ছোট্ট শিশু নিলিমা তার মাকে হারিযে বা পরবাসে রেখে বাবা মোস্তাফিজুরের কাছে বড় হচ্ছে একা। বাবা মেয়ের কোন কষ্ট যাতে না হয় সবদিকে লক্ষ্য রাখেন এমন কি মেয়ের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। নীলিমার দাদা দাদি নীলিমার জন্মের আগেই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে। থাকার মধ্যে একজন দূর সম্পর্কের নিলিমার বাবার বোন রমেলা তার একটি মাত্র ছেলে সন্তান নাম তার হালিম শেখ। সে লেখাপড়ায় অমনোযোগীর কারণে নিলিমার বাবা মোস্তাফিজুর তার একজন পরিচিত বন্ধু নাজিমের ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপে কাজ পাওয়ায়ে দেন। তা প্রায় তিন বছর গত হযেছে হালিমা এখন ধরতে গেলে হাতে কলমে নিজ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ট্রেনাপ। কারণ সে সব ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারে বিধায় মোস্তাফিজুরের বন্ধু নাজিম হালিমের উপর সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে আরেকটি ব্যবসায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। হালিমের বাবা ছোটবেলা হতেই নিলিমার দাদার কাছে থেকে মানুষ, মেট্রিক পর্যন্ত লেখাপড়া নিলিমার দাদার টাকা-পয়সায় মানুষ হয়েছে, উনারা মারা যাওয়ার পর মোস্তাফিজুরের সাথে টাঙ্গাইল শহরে মোস্তাফিজুরের বাবার কেনা বাসাতে এসে উঠে। মোস্তাফিজুরের বাবা ছিলেন টাঙ্গাইল বারের উকিল সেই সুবাদে আকুরটাকুর পাড়ায় বেশ জায়গা নিয়ে বাড়ি কিনেন। মোস্তাফিজুরের গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল শহরের সন্নিকটে থাকায় বাসা ভাড়া দিয়ে গ্রামের বাড়ি হতেই এসে কোর্টের কাজ সম্পূর্ণ করতেন। আর যদি কোন কেসের কাজে রাত্রি হয়ে যেতো তার জন্য বাসায় থাকতে হতো বলে দুই রুম নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে বাকী বাসা ভাড়া দিয়েছিলেন। বর্তমানে সে ভাড়াটে বাসাতে থাকেন সে মোস্তাফিজুরের বাবার পূর্ব পরিচিত এবং বিগত দীর্ঘকাল হতে বাসা ভাড়া নিয়ে অবস্থান করছেন। ভাড়াটে লোকটার নাম হাসমত আলী আকন্দ সকলে আকন্দ সাহেব বলেই ডাকেন, তার ছেলে মেয়েরা বিদেশ থাকেন। বিদেশ হতে পাঠানো অর্থ দিয়ে খায়, দায় এবং ভালো ভাবেই চলে। হাসমত আলী আকন্দের ছেলে মেয়েগুলি খুবই ভালো তাই বাবার যে বয়স তাতে বাবাকে কষ্ট দিতে চায় না। ছেলে-মেয়েরা তাহার চাহিদার অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে থাকেন। বৃদ্ধ বয়স বলে তার সাথে একজন তাকে দেখা শোনার জন্য বার/চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলে আছে নাম তার সজল। তাছাড়া প্রতিদিন রান্না বাড়া করার জন্য আম্বিয়ার মা নামক একটি মহিলাকে মাসিক মাইনা হিসাবে ঠিক করে নিয়েছে তাতে তার কোন অসুবিধা হয় না। যদিও স্ত্রী ব্যতিত রয়েছে। হাসমত আলী সাহেবের স্ত্রীর হঠাৎ শরীর শুকিয়ে শুকিয়ে বিছানাতে শয্যা শায়িত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন কিন্তু তার যে কি রোগ হয়েছিলো তা কোন ডাক্তার কবিরাজ কেউ নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়। যদিও আকন্দ সাহেব খায় দায় ভালো তবু স্ত্রী ছাড়া সংসার এভাবে কি দিন দুনিয়া কাটে। তদুপরী এটি মোস্তাফিজুরের ক্ষেত্রে কোথাও কোন শান্তি নেই। অনেক বলে মোস্তাফিজুরকে যেহেতু তোমার একটি ছোট মেয়ে, মেয়ের মায়ের প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ করে নাও। কিন্তু মোস্তাফিজুর রহমান কোনক্রমেই রাজী নয় শুধু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মোস্তাফিজুর বাবার মত কোর্ট কাচারীতে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এদিকে দূর সম্পর্কের বোন রুমেলা স্কুলে নেওয়া আনা খাওয়া দাওয়াসহ বাসার সকল পাক শাক করে থাকে। শুধু ছোটা কাজের বুয়া এসে সকাল বিকাল বাড়ি ঘরের অন্যান্য যাবতীয় কাজ কর্ম করে রেখে যায়। হালিমের বাবা সৌদি আরবে চাকরির সুবাদে রয়েছে ওদের পরিবার ও সচ্ছল ভাবে জীবন যাপন করে তথাপি যেহেতু ছোট বেলা হতে মোস্তাফিজুরের বাবা মার সাথে ছিলো তাই এমনও আছে এবং সেজন্য হালিমদের জন্য থাকার মত বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে। একদিন শুক্রবার নীলিমা বাসাতে এবং আকান্দ দাদু বাইরে উঠানে একখানা ইজি চেয়ারে বসে পত্রিকা দেখছিলেন সেই মুহূর্তে নীলিমা এসে বলে দাদু, দাদু তুমি কি ব্যস্ত না আমার সাথে কথা বলার সময় আছে। উত্তরে আকন্দ সাহেব কেন দাদু তুমি কি কিছু বলতে চাও নাকি সজলকে দিয়ে তোমার আইস্ক্রিম এনে দিতে হবে। আকান্দ সাহেব জানে প্রতি শুক্রবার হলে দাদুর কাছে একটি আইস্ক্রিম চাই, চাই নচেৎ সারা দিন কারো সাথে কথা বলবে না এমন কি খাওয়া দাওয়া করবে না। প্রতি শুক্রবার হলেই শুধু আকন্দ দাদুর কাছে আইস্ক্রিমের বায়না অন্য কেউ এনে দিলে সে তা খাবে না। এখন দাদু বুঝতে পারে যে নীলিমা আজ আইস্ক্রিম চায় বলে তখন দাদু বলেন দাদু ভাই তোমার কি আইস্ক্রিম সজলকে দিয়ে আনিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি সজলকে দিয়ে আইস্ক্রিম আনছি। আকন্দ সাহেব আইস্ক্রিমের কথা বলাতে আজ নীলিমার কোন সারা নেই হা হু ও বললো না। বললো শুধু, বললাম না আজ আইস্ক্রিম খাবো না। তখন দাদু ভাই বলেন কেন তুমি কি আমার উপর অভিমান করেছো নাকি এনে রাখিনি বলে রাগ করে খাবে না। তখন নীলিমা হেসে দাদু তুমি আমাকে বিরক্ত করো না তো। আজ তোমার কাছে যে জন্য এসেছি তা আগে শুনে নাও তারপর কথা। বুড়ো দাদুকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা। দাদু তোমার কাছে যে জন্য এসেছি তা হলো, দাদু ঐ যে নীল

আকাশ দেখছো তুমি বলতো ঐ নীল আকাশ কি করে ধরাছোঁয়া যায়। দাদু অবাক! এই মেয়েটি কি বলে। দাদু একটু হেসে, দাদু ভাই তোমার ঐ নীল আকাশ আর আমরা যেখানে বসে আছি তার দূরত্ব বা ফারাক কত দূর তুমি তা জানো। দাদুর কথার উত্তরে, হ্যাঁ দাদু আমি জানি। তবে বলো কত। দাদু জমিন আর আসমানের দূরত্ব প্রায় ১৫০০,০০,০০০ কিলোমিটার (একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত পৃথিবীর আকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেটকে ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখা যায়)। যেই নীলিমা উত্তর সঠিক হয়েছে তখন দাদু ভাই নীলিমাকে জড়িয়ে আদর করতে থাকে এমন সময় নীলিমার বাবা মোস্তাফিজুর এসে বলে কি করেছে মামা আমার মেয়ে যে সে এতটা আপনার আদর প্রাপ্য। আর বলো না মোস্তাফিজুর তোমার মেয়ে একজন জিনিয়াস সে জমিন আর আসমানের দূরত্ব অনায়াসে বলে দিতে পেরেছে যা অনেকেই আমরা জানি না। আকন্দ সাহেবের মুখে শুনে নীলিমাকে নীলিমার বাবাও জড়িয়ে ধরে আদর করে আর বলে দেখছেন মামা নীলিমা অনেক বড় হয়ে গেছে। তাতো হবেই তুমি যে ভাবে ওকে মানুষ করছো মা ছাড়া। মোস্তাফিজুর তুমি এক কাজ করো তুমি ওর জন্য একটা মা এনে দাও। আকন্দ সাহেবের কথার পরিপ্রেক্ষিতে মোস্তাফিজুর বলেন, না মামা আমি একা আছি আমার এই মা মরা মেয়ে নিয়ে আমি সারা জীবন একাই কাটিয়ে দিতে চাই। আকন্দ সাহেব বলেন দেখো বাবা আজ ওর জন্য তুমি সেক্রিফাইজ করছো কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ওর বিয়ে হয়ে পরের ঘরে যাবে তখন তো আমার মত একাকী হয়ে যাবে। মোস্তাফিজুর একটু হেসে কি যে বলেন মামা আপনি একাকী জীবন কাটাচ্ছেন না। দেখো বাবা আমার আর তোমার বয়সের পার্থক্য কত আমার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। মামা আপনাকে অনুরোধ মেয়ের সামনে এভাবে আমার বিয়ে নিয়ে কথা বলবেন না। ও মনে মনে কষ্ট পায়। আকন্দ সাহেব, বেশ বলবো না। মামা আপনি কি আমার উপর রাগ করলেন যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে ক্ষমা করে দিবেন। মামা আজ আপনার কাছে বলি নীলিমার আম্মা যখন শয্যাশায়িত তখন বলেছিলো যে নীলিমাকে একা রেখে গেলাম তুমি ওকে কোন কষ্ট দুঃখ আঘাত দেবে না। তবে আমি কবরে শান্তিতে থাকতে পারবো না। তবে তুমি পুরুষ মানুষ তোমাকে এ কথা বলবো না যে তুমি বিয়ে করো না। তুমি করতে পারো তবে দেখে শুনে নিও যদি নীলিমার কষ্ট না হয়। সেদিন নীলিমার মাকে বলেছিলাম নীলিমাকে নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি তোমার স্পর্শ আমার সমস্ত মন প্রাণ হৃদয় জুড়ে কাজেই আমি পুরুষ মানুষ হই বা না হই আমি তোমাকে কথা দিলাম আমি তোমাকে, ছুঁয়ে আমি নীলিমাকে আমার বুকের মাঝে আগলে রাখবো তাই বিয়ে তো দূরের কথা কোনোদিন আমার চিন্তাতে আনবো না। এ কথাগুলি নীলিমার মার মৃত্যুর দুদিন আগের কথা। থাক মামা (মোস্তাফিজুর একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে) আমি একটু বাইরে যাচ্ছি আপনি নীলিমাকে দেখে রাখবেন। তাছাড়া হালিম, আপনার সজল তো রইলো। যাবার সময় নীলিমাকে বলে গেলো নীলিমা মা তোমার দাদুকে বিরক্ত করো না কেমন। হালিমাকে ডাকতে ডাকতে মোস্তাফিজুর বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। পরক্ষণে দাদু ভাই তুমি কি আইস্ক্রিম খাবে। না আজ শুধু তোমার সাথে আকাশ পৃথিবী নিয়ে গল্প করবো। আকন্দ সাহেব বলেন, বেশ ভালো। তবে কি জানতে চাও বলো। নীলিমা তখন ইশারা ইঙ্গিতে অনেক কথাই দাদুকে জানালো দাদু কথায় যে খুশি নীলিমার এই বয়সে জ্ঞানের পরিধি দেখে। দাদু জানো আমি স্থির করেছি একদিন না একদিন ঐ নীল আকাশ স্পর্শ করবোই করবো। তা কি ভাবে দাদু ভাই হয় আমি বৈজ্ঞানিক হবো না হয় রকেট বিমান চালনার জন্য বৈমানিক হবো। দাদু আবার হেসে, দাদু ভাই আল্লাহ তায়ালা তোমার মনের আশা আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা পূরণ করুন আমি দোয়া করে গেলাম। দাদু দোয়া করে গেলাম মানে আমি যদি নাও থাকি। অবশ্যই তুমি থাকবে দুনিয়াতে এবং ঐ ব্যাপারে আমার সাফল্য দেখবো। দাদু আরও অট্টহাসি হেসে বেশ বেশ। মা মরা মেয়ে বলে স্কুল বাড়ি এবং বাড়িঘর আশেপাশে যারা নীলিমাকে চেনে জানে সকলেই স্নেহ দৃষ্টিতে দেখে সেই সাথে প্রত্যেক বাড়িতে আসা যাওয়াও আছে সর্বদাই।

এই ভাবে নীলিমা সকলের আদরে বড় হতে লাগে এবং একের পর এক ভালো ফল নিয়ে কৃতিত্বের সাথে এগোতে থাকে। যেখানে যে স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে ভর্তি হয় ম্যাথমেটিক ও ফিজিক্সের উপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে পাইলট, বিমান চালনার জন্য এক বছরের কোর্স কমপ্লিট করে এবং বিমানের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথমে ছোট ছোট দেশে আকাশ পথে যাতায়াত শুরু করে পরে আস্তে আস্তে পাকা হাত হলে আরও বড় বড় দেশে দূর হতে দূরে আসা যাওয়া শুরু করে। এই ভাবে নীলিমা আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন পেয়ে যায়। আর এদিকে বাবার বাড়ি সকলে নীলিমার জন্য প্রতিনিয়ত চিন্তা করে। আকন্দ দাদুর বয়স এখন প্রায় ৮৫/৮৬ বছর ছুঁই ছুঁই। প্রায় বার্ধক্যে এসে জানান দিয়েছে। এদিকে বাবা বলে তুমি আমার একমাত্র মেয়ে তোমার যা আছে তা নিয়ে চৌদ্দ গোষ্ঠী বসে খেতে পারবে। তোমার এতো বড় রিস্কের চাকরি করার দরকার কি। তোমার সম্মান বাড়ির সম্মান জেলার সম্মান সর্বোপরি আমাদের দেশের সম্মান এতটুকু তোমাদের জন্য দিয়ে যেতে চাই। তুমি যখন শুনবেই না তাহলে অন্ততপক্ষে বিয়ে করে নাও। বাবা আর কয়েক

দিন অপেক্ষা কর আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য আরেক ধাপ বাকী। বেশ তোমার স্বপ্ন পূরণ করো তারপর তো বিয়ে সাদি করবে। কি বাবা তুমি চিন্তা করো না তুমি চিন্তা করলে আমার সেদিন আর আগাতে পারি না তুমি আল্লাহকে সহায়ক ভেবে আমার জন্য দোয়া করবে দাদুকে বলবে। হালিম ভাই, রুমেলা ফুফুকে দোয়া করতে বলো। এই বলে আমেরিকার পথে আজ উড়োজাহাজ নিয়ে আমাদের বাংলাদেশের হযরত শাহাজাহাল বিমান বন্দর হতে রওনা হয়ে পথিমধ্যে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করে। পরে চার/পাঁচ ঘণ্টা অবসর নিয়ে আবার হিথ্রো বিমান বন্দর হতে উড্ডয়ন করলে প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার যাওয়ার পর ভীষণ ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয় ফলে ২০২ জন যাত্রী নিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা দেখে নীলিমা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয় এবং যাত্রীদের অবগতির জন্য জানায় যে আপনারা সিটবেল্ট বাধুন, কোন প্রকার ভয় পাবেন না। তাছাড়া নিরাপদ স্থানে অবতরণ করার পূর্ব মুহূর্তে নড়াচড়া করবেন না। আমরা চেষ্টা করছি নিরাপদ আশ্রয়ে অবতরণ করতে। আবারও বলছি কেউ কান্নাকাটি করবেন না বাকী আল্লাহ তায়ালার দয়া। সবাই আল্লাহকে ডাকুন। পুনরায় ইংরেজি অ্যানাউন্সমেন্ট করা হলো লেডি এন্ড জেন্টলমেন... এই অবস্থাতে ইংরেজি বক্তব্য শেষ করেন। ঝড়ের বিশাল বিশাল ঝাপড়া লাগছে মনে হয় বাতাসের গতি ঘণ্টায় ১০০/১২ এর উপরে তথাপি নীলিমা প্রাণপণ চেষ্টা করে উড়োজাহাজ পিছনের দিকে ঘুরিয়ে লন্ডনের আরেকটি বিমানবন্দর গ্যাটউইক-এর কন্ট্রোল রুমের সাথে যোগাযোগ করে অবতরণে সিগনাল পেয়ে আস্তে আস্তে অবতরণ করে এতে করে নীলিমার হাতে ২০২ জন বিমান যাত্রীর প্রাণ রক্ষা পায়। এই কথা সারাদেশের মানুষের কানে কানে রেডিও টিভির মাধ্যমে পৌঁছে যায়। রেডিও টিভির মাধ্যমে জানানো হয় যে বাংলাদেশি এক সাহসী নারী নিলীমা আহম্মেদ বিশাল ঘূর্ণিঝড়ের কবল হতে ২০২জন যাত্রীকে প্রাণে রক্ষা করেছেন। লন্ডনের একটি বিমান বন্দর গ্যাটউইকে অবতরণ করে। এই কথা বাবা মোস্তাফিজুরের কান পর্যন্ত পৌঁছায় সেই সাথে দাদু আকন্দ সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন এবং আল্লাহর কাছে জায়নামাজে বসে প্রার্থনা করছে। তারপর বাবা মোস্তাফিজুর ঢাকা হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের সহিত যোগাযোগ করে আরও বিস্তারিত জানতে পারে যে উড়োজাহাজের সকলেই নিরাপদ আশ্রয়ে আছে, নীলিমা এবং অন্যান্যসহ এরপর বাবা এবং দাদু ভাইয়ের মন শান্ত হয়। নীলিমার উড়োজাহাজ একদিন লন্ডনের গ্যাটউইক বিমানবন্দরে অবস্থান করার পর আকাশের অবস্থা ভালো হলে সিগন্যাল পেলে যেখান হতে বিমানটি উড্ডয়ন করে যথারীতি আমেরিকাতে ২০২ জন যাত্রী পৌঁছে দিলে ওখানকার উপস্থিত জনগণ করতালি এবং ফুলের মাধ্যমে যাত্রীদেরসহ নীলিমাকে গ্রহন করে। সে এক এলাহী ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো। নীলিমাকে আমেরিকা সরকার ২০২ জন যাত্রীকে নিরাপদ অবস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ায় নারী পাইলট হিসাবে আমেরিকান রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্মাননা প্রদান হিসেবে এক কোটি ডলার সেই সাথে আমেরিকায় থাকার জন্য আজীবন বাসস্থান উপহার দিলেন। এই আমাদের দেশের নারী হিসাবে এতো বড় সম্মাননা আজও কেউ পায় নাই। পক্ষান্তরে আমেরিকা হতে যখন নীলিমার উড়োজাহাজ বাংলাদেশে আসার জন্য আকাশ পথে উড্ডয়ন করল তখন হাজার হাজার বাঙালি অবাঙালি জনতা করতালীর মাধ্যমে বিদায় দিলেন। নীলিমা আকাশ পথে স্বাভাবিক লেবেলে উঠলে দুইবার আমেরিকার শহর প্রদক্ষিণ করে বিদায় নেয় এতে করেও হাজার হাজার জনতা করতালি দিয়ে অভিবাদন জানায়। আসলে মানুষ পারে না এমন কিছু নেই বিপদে আল্লাহর কাছে সহায়তা সাহায্য চাওয়া (এক) আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস (দুই) মস্তক সর্বদা সচ্ছল রাখা (তৃতীয়) সিদ্ধান্তে অবিচল অটল থাকা (চতুর্থ) লক্ষ্যস্থান স্থির করা। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম পুনরায় লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে ফিরে এলে সেখানে বড় ধরনে সম্মান জানায় লন্ডনের রানী ও প্রাইমিনিস্টার। তারপর বাংলাদেশে এলে তো কোনো কথাই নেই। নীলিমাকে নিয়ে যা করলো তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় উপরন্তু দেশ রক্ষায় জেড বিমানের পাইলট হিসাবে প্রমোশন দিলেন আমাদের সরকার এবং থাকার জন্য ফ্রি কোয়ার্টার। আসলে চিন্তা করলে বিষয়টি কেমন লাগে সেদিনের সেই পিচকা মেয়ে নীলিমা আকন্দ সাহেব মানে দাদুর কাছে মুখে বলেছিলো যে সে একদিন আকাশ ছুঁয়ে দেখবে। তার সেই বাক্য সত্যি সত্যি বাস্তবে রূপ নিয়েছিলো। নীলীমা ঢাকা হতে টাঙ্গাইল আসার পথে দু'ধারে সারি সারি স্কুল, কলেজ ভার্সিটি সর্বপরিজন, সাধারণ জনগণ তাকে অভিনন্দন এবং এক নজরে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসকের পক্ষ হতে সার্কিটহাউজের সামনে মঞ্চ করে বিরাট এক গণ আয়োজন করে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে। কথায় আছে না কৃতিত্বের একটা মূল্যই অন্যরকম। কাজেই আমরা সবাই নীলিমার মত আকাশ ছোঁয়ার যেন স্বপ্ন দেখি। একদিন দেখতে দেখতে নীলিমার মত বাস্তবে তার রূপ নেবো। সবচেয়ে বড় কথা মনের ইচ্ছা শক্তি প্রবল সবল থাকতেই হবে। মনে মনে স্থির করে নিতে হবে আমাকে এই হতে হবে। যে কোনো ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে কেউ সম্মান না দিলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দিয়ে থাকেন। আমার লেখাটি নীলিমা উপলক্ষে এবং দিক নির্দেশনার একটি পথ দেখানো হলো মাত্র। তবে দেশকে কিছু দিতে গেলে দেশের জন্য সম্মান

বয়ে আনতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের নীলিমা হতে হবে যাতে পৃথিবীর মানুষ জানুক। যাহা হোক নীলিমার একদিন বিয়ে হয়ে গেলো ঘর সংসার হলো, সন্তানাদি হলো, দেশেবিদেশে অবস্থান করে ছেলেমেয়েদেরকে মানুষের মত মানুষ করলো। যদিও নীলিমা চরিত্র সমূহ কাল্পনিক বক্তব্যও কাল্পনিক তবে নীলিমা চরিত্রের মতো আমরা বাস্তবে চেষ্টা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে নীলিমা হতে দোষ কোথায়, আজ বাবা-মা বাড়ির সকলের প্রিয়পাত্র হতে বা কে আটকাবে।

অজ্ঞাত বসবাস

বিদেশ হতে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে রুহিত হাসান ছুটছে সে গ্রাম বাংলার বাড়িতে। ওখান থেকে মোটিভেশনাল মানে প্রেরণামূলক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির মাধ্যমে যে কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ করে গড়ে তুলবেন। যদিও বাসাতে বাবা মার বারণ তবুও বিদেশ হতেই লক্ষ্য স্থির করা মন ভরে নিয়ে ছুটে চললো সেই দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের উদ্দেশ্যে। সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া ট্রেন স্টেশন ঢাকা হতে উল্লাপাড়া পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত্রি ৯টা বেজে যায়। ট্রেন নাকি সচরাচর বিকেল ৪ ঘটিকার মধ্যে হয়তো ক্রসিং এর জন্য আধা ঘণ্টা/পনেরো মিনিট কিংবা এক ঘণ্টা স্টেশনে পৌঁছাতে দেরী হয়। কিন্তু এতোটা দেরী হবে রুহিত হাসান তা ভাবে নাই। স্টেশনে নামার পর একদিকে ক্যারেন্ট নেই অন্যদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্টেশন হতে মাথার উপরের আকাশ দেখা যায় যে কালো মেঘে ছাওয়া পরিষ্কার দেখাই যায় না। হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড় বৃষ্টি আসতে পারে। যাই হোক গ্রামের বাড়ি পঞ্চক্রোশী যেতে হবে যে কোনোভাবে উল্লাপাড়া স্টেশন হতে। এদিকে মাঝে মধ্যে আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস মৃদু মৃদু ভাবে গায়ে এসে কাঁটার মত বিঁধছে। আমি স্টেশনের বাইরের দিকে পা রাখতে পুনরায় বিজলী চমকালে দেখতে পাই আমার পিছনে একটি মেয়ে হাতে ব্যাগ নিয়ে আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে। প্রথমত লক্ষ্য করিনি যে কেউ স্টেশনে আছে। ভেবেছিলাম শেষমেষ আমি বোধ হয় বিপদে একা পড়ে আছি। কারণ অনেক দিন পরে আসা পথ ঘাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যদি পূর্বের হতে জানা থাকতো তবে বাবা-মাকে দিয়ে বলিয়ে রাখতাম স্টেশনে যাতে আগে ভাগে লোক পাঠিয়ে রাখতেন। যতই আমি একা স্টেশন ত্যাগ করার চেষ্টা করছি ততই মেয়েটি আমাকে অনুসরণ করে ঘনিষ্ঠ বা কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। আমি মনে মনে ভয় পেলাম কারণ আমি একজন পুরুষ মানুষ আর অন্য পক্ষে যে আমার পিছু নিয়েছে বা অনুসরণ করছে সে একজন মেয়ে বিরক্তি এখানেই। যাই হোক আমি যখন স্টেশনের বাইরে গ্রামের বাড়ি পঞ্চক্রোশী যাবার জন্য পাগলের মতো এদিক সেদিক অন্ধকারে যানবাহন খুঁজছি মেয়েটি ততই আমার নিকটে নিকটে আমি যেদিকে যাচ্ছি মেয়েটি সেদিকে যাচ্ছে। এহেন অবস্থায় এখন আমি কি করে কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। খানিকক্ষণ চিন্তা করে অবশেষে মেয়েটির কাছে এসে জানতে চাইলাম। আচ্ছা আমি দেখছি সেই কখন হতে আমার পিছু পিছু ঘুরঘুর করছেন। কেনরে ভাই

আপনি কি আমার চেনা না আমি আপনার চেনা। কেউ কাউকে চিনি না জানি না তার উপর রাত্রি লোকজন দেখলে বলবে কি।

দেখুন আমি বিপদে পড়েই আপনার পিছু নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। কারণ ভদ্র ঘরের ছেলে মনে করে এই স্টেশনে আমার বাড়ির লোকজন থাকার কথা ছিলো হয়তো আমার দেরী বা আসবো না ভেবে চলে গেছে। আমি আমার বাড়ির সাথে যোগাযোগও করতে পারছি না। যাদের সাথে যোগাযোগ করবো তাদের সাথে যোগাযোগ করার মত ব্যবস্থা নেই। কারণ মোবাইলখানা বাসাতে ফেলে রেখে এসেছি। তখন মেয়েটিকে রুহিত বললো, তাহলে এখন কি করবেন। আমি আমার গ্রামের বাড়ি পঞ্চক্রোশী আর আপনি।

আমি আপনার পাশের গ্রাম সলপ ইউনিয়নের ঐ সলপ ইউনিয়ন আমার গ্রামের বাড়ি। পুনরায় রুহিত হাসান প্রশ্ন করল, তা হলে উপায় মেয়েটি বললো আপনি একজন পুরুষ মানুষ আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন উপায়। আরে মশাই উপায় তো আপনি বের করবেন। তা নয় কারণ আমি প্রায় বিশ বছর পর গ্রামের বাড়ি এসেছি। বর্তমানে এখানকার পথ ঘাট কিছুই চিনতে পারছি না। মেয়েটি পুনরায় রুহিতকে জানালো যে যাওয়ার জন্য আপনি একটা ব্যবস্থা করুন তারপর পথঘাট আমি চিনিয়ে নিতে পারবো। কারণ প্রায় প্রায় আমার বাড়িতে আসা হয়ে থাকে। এখন মেয়েটির কথার জোর বেড়ে যায়। কারণ মেয়েটি একজন নির্ভরযোগ্য গাঁয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গী পেয়েছে তাও আবার নিজের এলাকা পেরিয়ে যেতে হবে, বলতে গেলে সোনায় সোহাগা। রুহিত মনে মনে ভাবে এমনি আমি কোন বাহন পাচ্ছি না তার উপর ঘাড়ের উপর আস্ত একটা মেয়ে মানুষ চেপে বসেছে চেনা নেই জানা নেই অজানা একটি মেয়ে মানুষ। মেয়েটি রুহিতের বিড়বিড় করা দেখে বলে আপনি কি আমাকে কিছু বলছেন রুহিত মেয়েটির কথার উত্তর না দিয়ে পুনরায় পঞ্চক্রোশী যাওয়ার জন্য বাহন খোঁজ করছে। একদিকে বিদ্যুৎ নেই অন্যদিকে কালো অন্ধকার। কাছের একজন আরেক জনকে বলতে গেলে দেখাই মুশকিল যদি না মাঝে মধ্যে বিজলী না চমকাতো। রুহিত বিজলীর আলোতে মেয়েটির মুখ দেখে পেয়ে ভাবে এতো সুন্দর মেয়ে না আমার সাথে না দেখা হতো তবে কি উপায় হতো? না একা বাড়ি যেতে পারতো, না একা স্টেশনে বসে রাত যাপন করতে পারতো, না ঢাকা শহরে পুনরায় ফেরত যেতে পারতো। তাহলে উপায় কি হতো আসলে এমনি করে মেয়েদের বড় ধরনের বিপদ আসে ক্ষতি হয়ে থাকে। তাছাড়া মেয়েটির সাথে এতো কথা হলো তো এখনো মেয়েটির নামটি জানা হলো না। মেয়েটির কাছে এসে রুহিত বলে আচ্ছা আমাদের মধ্যে এতো কথা হলো তা আপনার নামটি জানা হলো না। আপনার নামটি বলবেন যা দিয়ে কথা বলা যায়। দেখুন আমার নাম রুহিত হাসান। পনেরো বছর বিদেশ থেকে লেখা পড়া এবং গ্রাম, সমাজ, গ্রামের মোটিভেশন কিভাবে করা যায় তা নিয়ে থিসিস করেছি। আর সেই জন্য নিজ গ্রামে আসা।

আমার নাম কেয়া খান আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে এখন একটা প্রাইভেট জব করছি। গ্রামের বাড়িতে বাবা মা এক ছোট ভাই সিজান খান সবে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে। বাবা হাই স্কুলের মাস্টার। বাবার নাম ইমতিয়াজ খান। বাবাকে ছোট বড় সকলেই চেনেন। ওদের মধ্যে পরিচয় কথা শেষ হতে না হতে মোটাসোটা একজন ভ্যানওয়ালা এসে দাঁড়াতে রুহিত হাসান ভ্যানওয়ালার কাছে গিয়ে বলে ভাই পঞ্চক্রোশী যাবেন। ভ্যানওয়ালা প্রশ্ন করে কার বাড়ি যাবেন স্যার, লোকটার ভরাট গলা শুনে মনে হলো ডাকাতের মতো মুখে গোফ দেখে মনে হয় বাংলাদেশ হতে চীন। পরক্ষণে পঞ্চক্রোশী চৌধুরী বাড়ি আর উনি সলপ ইউনিয়নের ইমতিয়াজ খানের বাড়ি। ভ্যানওয়ালা বলে ও স্যার বুঝতে পেরেছি আপনি হলেন পঞ্চক্রোশী শওকত হাসান চৌধুরী বাড়ি আর উনি স্কুল মাস্টার ইমতিয়াজ খানের বাড়ির তা কেন স্যার আপনারা বিবাহিত নয়। আমতা আমতা করে হ্যাঁ না মানে এর মধ্যে রইলো কিন্তু কেয়া খান তখন ভাবে বুঝিয়ে দিলো ভ্যানওয়ালাকে যে তারা বিবাহিত। রুহিত হাসান কিছু বলতে যাবে কিন্তু কেয়া রুহিতের কোমরে চিমটি কেটে কোন কথা না বলার জন্য বুঝিয়ে দিলো। ভ্যানওয়ালা স্টেশন হতে রওনা দিতে না দিতে ছিটেফোটা বৃষ্টি নামতে শুরু হলে রুহিত আর কেয়া উভয়ে চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। যদি রাস্তাতে এর চেয়ে জোরেশোরে ঝড় বৃষ্টি আসে তবে কি হবে কোথায় দাঁড়াবো কোথাতে গিয়ে উঠবো রাস্তার আসে পাশে কোন বাড়ি ঘরও নেই শুধু আছে গাছ আর ঝোঁপজঙ্গল। ভ্যানের সাথে হারিকেন বাঁধা যা হতে যতটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে বা যা দিয়ে যতটুকু দেখা যায়। আর মাঝে মধ্যে আকাশ হতে বিজলী আলো যতটা পাওয়া যাচ্ছে এই আর কি। এর মধ্যে ভ্যানওয়ালা বলে যে ভালো ভালই আমাকে ভ্যানচালক হিসেবে পেয়েছেন স্যার তা না হলে এতো রাত্রিতে এই অন্ধকারে পথে যেতে আপনাদের কষ্টই হতো। শোনেন স্যার এত ভয় পাচ্ছেন কেন যদি ঝড় বৃষ্টি আসে হয়তো সামান্য ভিজতে পারেন বা নাও পারেন তবে এ সামনে ব্রিজ পেরোলে আমার বাড়ি না হয় থেকে গেলেন। ভ্যানওয়ালা কথার ফাঁকে কেন যেন কেমন ভাবে তাকায়, তাতে মনে হয় বড় ধরনের সন্ত্রাসী দুই চারটা মার্ডার করেছে আমাদেরকেও রাস্তাতে মার্ডার করে ফেলে রেখে সব নিয়ে

যাবে। এদিকে রুহিত নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে কারণ রুহিত এ রকম পরিস্থিতিতে চলাফেরা করে নাই। তবুও এই সকল নানাবিধ মনে করতে করতে ব্রিজের কাছাকাছি এলে চারদিক হতে ভ্যানসহ রুহিত কেয়াকে ঘিরে ধরে। এই আচমকা ঘিরে ধরায় ভয়ে উভয়ে কি করবে না করবে বুঝে উঠতেই ভ্যানওয়ালা ঘিরে ধরে রাখা একজনের কাছে গিয়ে কানে কানে যেন কি না কি বলতেই ছালাম সর্দার বলে জান ছেড়ে দে। ভ্যানওয়ালা পুনর্বার উঠে ভ্যান চালাতে চালাতে বলে মনে হয় আপনারা ভয় পেয়েছেন। ভয় পাওয়াই কি স্বাভাবিক নয়। তা ঠিক তবে আপনাদের রক্ষার্থে আমি ছিলাম তা না হলে কি যে কি হতো তা আল্লাহ মালুম। ভ্যানচালকের সাথে কথায় কথায় আরো অনেক আলাপ হলো জানা হলো রুহিতের বাবার কথা। ভ্যান চালক জানালো, আমি যখন দুটি মার্ডার কেসের আসামী তখন দিশা মিশা না পেয়ে একজন লোক মারফত জানতে পারলাম পঞ্চক্রোশীর একজন বড় মাপের লোক আছে যে নাকি ব্যারেস্টার নাম শওকত হাসান চৌধুরী। আমি তিনার কাছে গিয়ে সত্য কথা খুলে বললাম যে স্যার এই মার্ডার দুটির সাথে আমি জড়িত ছিলাম না। চুরি ডাকাতি করি পেটের দায়ে। সংসারে অন্য কোনো অবলম্বন নাই বলে এক সময় কাজের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে লাথি উষ্টা খেয়েছি কিন্তু কোনো কাজ পাইনি তাই মনস্থির করেছি ঐ সব লোকগুলির অর্থ সম্পদ লুট করে ঐ সকল লোকের মাঝে বিলিয়ে দেবো যারা কোনো কাজ পায় না বা উচ্চ বিলাসি হয়ে কাজ দেয় না তাদের টাকা পয়সা এনে বিলিয়ে দেবো আমি তাই করতাম। কিন্তু কোন মার্ডার টার্ডার করতাম না। মার্ডার করতো কসিম খাঁ। কসিম খাঁ আমার ছোট ভাই। সে মার্ডার করতো মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে। চৌধুরী মানে আপনার বাবা শওকত হাসান চৌধুরী বিশ্বাস করে মার্ডার কেস হতে মাফ করে দিয়েছিলেন, আপনি তারই ছেলে তাই আপনার পরিচয় পেয়ে আমার জান থাকতে কোনো ক্ষতি হোক তা আমি হতে দেবো না। তাই ঐ কথায় ওদের দলের প্রধানের কানে কানে বলে দেওয়ায় আপনাদের ছেড়ে কিছু না নিয়ে চলে গেলো। অবশ্য এই দলের প্রধান ডাকাতের সর্দার ছিলাম আমি কিন্তু আমার বড় ছেলে অসুস্থ হয়ে হঠাৎ মারা যাওয়ায় মা ও বৌয়ের অনুরোধে ডাকাতির পথ ছেড়ে এখন ভ্যান চালাই। রুহিত এবং কেয়া ডাকাতের কথা শুনে নিথর হয়ে বসে রাইলো। এমন সময় হঠাৎ এতো ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো যে ভ্যানচালক আলাল সর্দার ভ্যান টানতে পারছিলো না। এদিকে ভ্যান চালকের বাড়িও আর মাত্র হাঁটা পায়ে ৪/৫শত গজ। ভ্যান চালকের ভ্যানে প্রতিদিনের মত আজও একটা ছাতা গাড়ির সাথে বাধা আছে তা খুলে রুহিতের হাতে দিতে দিতে স্যার এই সামনে আমার বাড়ি এখানে ঝড় বৃষ্টি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এরপর যাওয়া যাবে। এ কথা রুহিত এবং কেয়া শোনার পরে মনে হলো ভ্যান হতেই পড়ে যাবে। রুহিত কোন কথা না বলে, না না আপত্তি থাকবে কেন। মরি আর বাঁচি ঝড় বৃষ্টি হতে তো রক্ষা পেলাম কি বলো রুহিত। রুহিতকে কেয়া নাম ধরে ডাকায় অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আর মনে মনে বলতে থাকে মেয়েটির সাহস আছে। ভ্যানওয়ালা আলাল সর্দার আমাদের ঝড় বৃষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছাতা দিলেও কি বৃষ্টির সাথে ঝড়ের ঝাপটায় উভয়ে শরীর পর্যন্ত ভিজে গেছে আর ভ্যান চালকের তো কথাই নেই সে এমন ভিজা ভিজেছে যে ঠাণ্ডায় কাঁপছে। তবুও ঝড় বৃষ্টি না থামাতে ভ্যান চালক অনেক অনুনয় বিনিময় করে রুহিত আর কেয়াকে রাস্তায় হাতে পায়ে ধরে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। আলাল সর্দারের (ভ্যান চালক) দুপাশে দুটি দু'চালা ঘর ঘরের বারান্দাতে রুহিত আর কেয়াকে দাঁড় করিয়ে আলাল তার বৌকে দরজা ঠুকাতে ঠুকাতে ডাকে নিজামের মা নিজামের মা। নিজামের মা উত্তরে, কি হয়েছে ডাকাতের বাড়ি কি ডাকাত পড়েছে। নাকি কাউকে চোখ মুখ বেঁধে ঘরে বন্দি করে মুক্তিপণ আদায় করবে। যেই এই কথা রুহিত আর কেয়ার কান পর্যন্ত পৌঁছালে সেই কেয়া হায় আল্লাহ কি মসিবতে পড়লাম একি কথা শুনছি তবে কি আমাদের বন্দি করার জন্য ভ্যানওয়ালার ঘরে এনেছে। রুহিত ভীতু চোখে কেয়ার দিকে তাকিয়ে বলে দেখা যাক কোথার জল কোথায় গিয়ে থামে। ইশ এদিকে দেখছেন না ঝড় বৃষ্টি যেন বেড়েই চলছে আজ রাতে থামবে বলে মনে হয় না। কেয়া একটু হেসে আমার মনে হয় আপনি আমার চাইতে ভীরু ভীতুর ডিম। দেখেন আপনি এ গাঁয়ে থাকেন আর আমি সেই কবে এসেছিলাম সেই জন্য নচেৎ আমরাও সাহস কম নয়, তাতো দেখতে পাচ্ছি যে ভাবে শরীর কাঁপছে। কি যে বলেন কেয়া এ কাঁপা সে কাঁপা নয়। আমার কাঁপা হচ্ছে শীতে। রুহিত আর কেয়ার কথোপকথনে হঠাৎ খট করে দরজার খিড়কি খোলার আওয়াজ। দরজা খুলেই ভ্যানওয়ালাকে কি মহা ভারত উদ্ধার করেছো, কি রাজকার্য শেষ করে এতো রাত্রি এসে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙালে। আচ্ছা আজও কি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে কবে আক্কেল জ্ঞান হবে। আরে আমি কি একা ছেলে মেয়েও তো ঘুমাচ্ছে (একটু থেমে) বল কি করতে হবে আমাকে? কাউকে নিয়ে এসেছো নাকি বাধার জন্য দড়ি কাচি আনতে হবে। ভ্যানওয়ালা বৌ এর চেঁচামেচি শুনে। বৌ এর মুখ চেপে ধরে আরে চুপ করবি। নাকি না শুনেই বাড়ি সুদ্ধ মাথায় তুলবি। শোন আমার সাথে কাদের নিয়ে এসেছি জানিস যিনাদের নিয়ে এসেছি। তিনারা পাশের গাঁয়ের

ব্যারেস্টার শওকত হাসান চৌধুরীর ছেলে আর ছেলের বৌ। (ভ্যানওয়ালার স্ত্রী) তাই তা আগে বলবেতো। তুই কি আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছিস। দে দে ও ঘরের চাবিটা দে। ভ্যান চালকের স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে ভেতরে গিয়ে চাবিটি দিলে ভেজা শরীরে আরো ভিজে দৌড়ে এসে তালা দেওয়া দরজা খুলে দিয়ে সাথে সাথে হারিকেন নিয়ে তা দিয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিলে সামান্য তবুও আলোর মুখ দেখা দিলো। এদিকে আরও বেশী জোরেশোরে ঝড়বৃষ্টি বাড়তে থাকে যেন সব কিছু বাতাসে ভেঙেচুরে নিয়ে যাবে এমনি পর্যায় পড়েছে চোর থাক ডাকাত থাক আপাতত তো নিরাপদ স্থানে আছি। তারপর যা হবার হবে, হয়তো গলা কেটে সর্বস্ব নিয়ে নিতেই পারে। তাছাড়া কিবা করার আছে। তবে আলাল ডাকাতের সর্দার তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। কারণ ওর চোখের চাহনি ওর কথা বার্তা হাঁটা চলায় ডাকাতি করতো বা করেছে তা প্রকাশ পাওয়া যায়। তখন এমন করে কিনা আমাদের জানা হয় নাই। তবে কোন এক ফাকে জেনে নেওয়া যাবে। আলাল পুনরায় এতো ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তার ঘরে এলে রুহিত বলে আপনার সমুদয় কাপড় ভিজে গেছে যদি এক্সট্রা কাপড় থাকে তাহলে বদলে নিতে পারেন আমি বারান্দায় দাঁড়ালাম। কেয়া রুহিতকে বলে আপনিও নিন। দুজনেই ভেজা কাপড় বদলে নিয়ে ঘরে টাঙ্গানো রশির মধ্যে শুকা দিয়ে দুজন নিজের দূরত্ব রেখে পাতানো চৌকিতে বসে নিজেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার ফাঁকে, আলাল সর্দার তার ঘরে এসে বলে ঘরে কি কিছু খাবার আছে। শুধু ভাত আছে তাছাড়া আর কিছুই নেই। এই ঝড়বৃষ্টির মাঝে উনুনের কাছে গিয়ে উনুন জ্বালিয়ে ডিম ভেজে দেবো তারও 'জো' নেই।

আপনি এক কাজ করুন ঘরে মুড়ি আর পাটালী গুড় আছে তাই আজ রাতের মত তাদের সামনে দিন। তারপর সকাল হলে ঝড় বৃষ্টি থেমে গেলে গরম গরম ভাত, আর পালের মুরগি আছে তারই একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। মন্দ নয় তবে তারই ব্যবস্থা করো। দাও দাও মুড়ি আর পাটালি গুড় দাও তাই দিয়ে রাতটা সেরে নিতে বলি। আর তুমিও আমার সাথে এসো বেরেস্টারের ছেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। না থাক এতো রাতে দরকার নেই সকাল হলেই হবে। তোমাকে সাবধান করে দেই এদের কাছে কিন্তু চাওয়া চাওয়ি করবে না। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে। তুই জানিস না ঐ ছেলের বাবা বেরেস্টার শওকত স্যার আমার যে কত বড় উপকার করেছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। তাহলে উপকারের প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করো। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে আর জ্ঞান দিতে হবে না। যাই হোক যেভাবেই হোক রুহিত ও কেয়ার ঘরে পৌঁছে দিলো আলাল সর্দার গুড় মুড়ি। স্যার গো এতো রাতে এর বেশি আপনাদের সামনে দিতে পারলাম না। এ খেয়ে রাত্রিটা চালিয়ে নিন। রুহিত ও কেয়ার মুখের দিকে আবার আলালের দিয়ে তাকিয়ে আপনি ভাই খাবার দাবার নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না যা দিয়েছেন এই আমাদের জন্য যথেষ্ট কি বলো কেয়া। হ্যাঁ তাই। তাহলে খেয়ে দেয়ে আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন সকাল হলে ঝড় বৃষ্টি কমে গেলে আপনাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবো। রুহিত উত্তরে, আচ্ছা। আলাল মুখে একরাশ হাসি দিয়ে চলে যায় নিজের শয়ন ঘরে। এদিকে রুহিত এবং কেয়ার হলো সমস্যা কারণ ওদের মধ্যে না আছে পূর্বচেনা জানা না আছে দেখা সাক্ষাৎ এইটা আজি দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা। তার মধ্যে অচেনা অজ্ঞাত বসবাস। টিনের চালে ঝড় বৃষ্টি প্রবল ধারায় আচরে পড়ছে ওরা দুজন মুখোমুখি হয়ে মুড়ি গুড় পানি খেয়ে একজন আরেকজনকে বলছে খাওয়া দাওয়াতো যা হবার হয়েছে এখন শোওয়া। চোকিতো মাত্র একটা বিছানাও তাই। রুহিত বলে কি আর করা আপনি চৌকিতে আমি এ কোণাতে চেয়ারে বসে রাত্রিটা কাটিয়ে দেবো। যদি একটা বই বা লাইট থাকতো তবে তো কোন কথাই ছিলো না। কেয়া তাই কি হয়। আপনার অভ্যাস নেই আমার যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস আছে কাজেই আপনি চকিতে শুয়ে পড়ুন আমি নিচে পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। না আপনি চৌকিতে থাকেন আমি নিচে.... এভাবে দুজনের মধ্যে কথা বিনিময়ের মধ্যে হঠাৎ এমন জোরে বজ্রপাত হলো যেন কেয়া ভয়ে এসে রুহিতকে জড়িয়ে ধরে। রুহিত হতভম্ব অবাক কি করবে না করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। যে কেয়া এভাবে এসে বুকের উপর ঝাপটে পড়বে। কিছুক্ষণের মধ্যে কেয়ার চৈতন্য ফিরলে দেখে রুহিতের বুকে ঝাপটে ধরে আছে, পরক্ষণে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে নিলে, রুহিত বলে যা হবার হয়ে গেছে এতে লজ্জার কিছু নেই। চলেন এখন শুয়ে পড়া যাক। কেয়া খুব সুন্দর পরিপাটি করে শোয়ার ব্যবস্থা করলেও আবার দূর হতে মনে হয় আমরা যে রাস্তা দিয়ে এসেছি আশেপাশে কোথা হতে ভেসে আসছে ডাকাত পড়েছে ডাকাত পড়েছে কে কোথায় আছেন আপনারা বেরিয়ে আসেন। এই শব্দ রুহিত এবং কেয়ার কান পর্যন্ত পৌঁছালেও আলাল সর্দারের কান পর্যন্ত পৌঁছাতে বাদ গেলো না। আলাল সর্দার ইয়া বড় এক রামদা আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে স্যার স্যার আপনারা ঘুমিয়েছেন। ঘরের ভেতর হতে রুহিত বলে, না আলাল ভাই আমরা এখনও জেগেই আছি। তবে থাকুন আমি দেখছি আপনাদের কোনো ভয় নেই। ঠিক আছে বলে উভয়ের মধ্যে কথা শেষ হলে আলাল নিজে নিজেই বলে আমার এলাকায় ডাকাতি রামদা দিয়ে কুপিয়ে লাশ ফেলে দেবো না। আমি আলাল সর্দার এখনও বেঁচে আছি এই কথা বলে

দৌড়ে বাইরের দিকে চলে যেতেই পেছন পেছন আলালের স্ত্রী মর্জিনা আর ছেলে নিজাম ঘুম হতে উঠে বাবাকে বাধা দিলে বাধা বারণ না শুনে যে দিক হতে ডাকাতি হতে শোনা যাচ্ছিলো সেদিকে দৌড়াতে থাকে। আলাল পাকা রাস্তার কাছে এলে দেখে একটি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে, মাইক্রোবাসটির চারিপাশে ডাকাত সদস্যরা ঘিরে রেখেছে ডাকাতির উদ্দেশ্যে অবশ্য পূর্বসংবাদের ভিত্তিতে এই ডাকাতি। গাড়িটি আসছিলো একটি বিয়ে বাড়ি হতে বর যাত্রীসহ। তাই স্বর্ণ অলংকার টাকা পয়সা লুণ্ঠন করে নেওয়ার প্রস্তুতি মাত্র তারই মধ্যে আলাল সর্দার এসে উপস্থিত এবং বলে কিরে আমার এলাকাতে এসে ডাকাতি। তোরা জানিস না আমার এলাকাতে কোন ডাকাতি চুরি বদমায়েশি নিষেধ। ডাকাত সদস্যের মধ্যে একজন আলালকে দেখে চিনতে পেরে জ্বি সর্দার। তবে কেন হাটিকুমরুল ইউনিয়নে ডাকাতি করতে এসেছিস। আমি যদি মনে করি তোদের প্রত্যেকের ঘাড় হতে কল্লাটা আলাদা করে দিতে পারি। আরে বেটা ডাকাতি করবি বড় বড় মহাজন বড় বড় অবস্থাশালী আড়তদার, মুনাফা খোর, সুদখোর, ঘুষখোর, ভূমি দখলকারীর বাড়ি ঘরে যারা একবার ছাড়া যতবার গড়ে নিতে পারে। কিন্তু এই ছেলেমেয়ের নতুন সংসার হবে ঘর হবে তাদের ভবিষ্যৎ স্বমূলে ধ্বংস করে দিতে চাইছিস কেন। ডাকাত দলের মধ্যে সর্দার যে, সে কাছে এসে মুখ খুলতেই আরে কছিম তুই। আলাল রাগত স্বরে তাহলে তো তোর কল্লাটা ফেলেই দিতে হয় কত বড় সাহস।

সর্দার সর্দার আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে মাফ করে দাও। আলালের পায়ের উপর পরে যায় আর অন্যদিকে গাড়ি হতে বর ও কনেসহ ওরা সব দেখছিলো এবং কথা শুনছিলো আবার কেউ কেউ বলাবলি করছিলো শুনেছিলাম ডাকাতরা পশু হয় তাদের হৃদয় থাকে না তারা যখন তখন যা খুশি করতে পারে। কিন্তু না এখানে যা দেখলাম তার ব্যতিক্রম। এরই মাঝে ডাকাতদের হতে একজন সর্দার আমরা কি সাধে ডাকাতিতে নেমেছি আজ নেমেছি কারণ আজ কদিন ধরে বাড়িতে চাল নেই, ডাল নেই। ছেলে মেয়েরা হাউমাউ করে কাঁদছে। আমি সবই বুঝি তবু তোরা নিরীহ যাত্রীদের বিশেষ করে নতুন জীবন শুরু করার আগে তাদের ধ্বংস করে দিসনে তাহলে আল্লাহ সহ্য করবেন না। বর যাত্রীর মধ্যে একজন নেমে এসে বলে, ভাই আসলে কেউ মায়ের পেট হতে জন্মে চোর ডাকাত খারাপ হয়ে উঠে না আর মধ্যে লজিক কোন কারণ থাকে। আলালের কাছে এসে ভাই আপনি যে আমাদের কত বড় উপকার করলেন তার প্রতিদানে হয়তো কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এখানে আমার একটা কার্ড আছে আপনারা যে কজন আছেন এখানে তারা সকলে আগামী রবিবার অফিস টাইমে গিয়ে দেখা করবেন। আর এই যাওয়ার ভাড়ার টাকা এবং রবিবার হতে যে কদিন বাকী আছে তার জন্য আপনাদের খাবার হিসেবে পনেরো হাজার টাকা আর যদি ভাই আপনি কিছু না মনে করেন আপনাকে কিছু টাকা দিতে চাই যদি ভাই হয়ে ভাই এর হতে নিতে আপত্তি না থাকে তবে কোন উপকারের প্রতিদান হিসাবে নয়। আলালের নিতে আপত্তি হলেও জোর করে দশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল তুলে দিলো। ডাকাতের সর্দার কছিরকে বলে তোরা উনাদের সাথে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আয়। কোথায় যাবেন। আপাতত উল্লাপাড়া পর্যন্ত তারপর, বেশ ও তোরা উনাদের উল্লাপাড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয় তো। ঠিক আছে সর্দার পিছনে আরও দুইটি মাইক্রোবাস ছিলো ওরা তিনটিতে পাহারা দিয়ে উল্লাপাড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো। আলাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে পরক্ষণে বাড়িতে চলে আসার আগেই ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। আস্তে আস্তে আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। বাড়িতে এসে শুনতে পায় যে রুহিত এবং কেয়ার কথার আওয়াজ। আলাল স্যার স্যার করে ডেকে, হ্যাঁ বলুন আলাল ভাই। আপনারা এখনো ঘুমান নাই। ভাবলাম ভয়ে হতো। আরে না না আপনি আছেন না। তাই সকাল হয়লে কথা হবে এখন ঘুমান।

ভোর হতে না হতেই পাখিদের কলবর কি মধুর সুর কি যে ভালো লাগছে। এ সময় ফুলের গন্ধ দূর হতে ভেসে আসে মৃদু বাতাসের সাথে। পথচারীদের আনাগোনা শব্দ দু একটা ভ্যান বা সাইকেল বা মোটরযানের হর্নের আওয়াজ। উল্লাপাড়া শহর ঘেষা গ্রাম হলেও কিছুটা শহরের আচ পাওয়া যায় কারণ আলাল সর্দারের বাড়ি ঘেঁষা মোটামুটি দশ/বারো ফিট পরেই পাকা কার্পেট করা রাস্তা। আসলে আমাদের অনেক অনেক গ্রাম উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। যাক দেখা গেলো আলাল সর্দার সকাল হতে না হতে নদীর পাড়ে গিয়ে ছেলেদের (মাঝি) খরার মাধ্যমে নদী হতে মাছ তুলে বিক্রয় করে তাই কিনে নিয়ে আসে। সাথে পাড়ার বাড়ির মুরগির খোয়ার হতে দেশি দুটি মোরগ নিয়ে বাড়ি ফিরে। আলালের স্ত্রী মর্জিনা ফজরের নামাজ পড়ে উনুনের ঘর পরিষ্কার করে রান্নার কাজে হাত দিয়েছে। ছেলে এখনো ঘুমাচ্ছে চারদিকে টুংটাং শব্দের আওয়াজে রুহিতের ঘুম ভেঙে গেলে দেখে কেয়া রুহিতের পাশে হাতের উপর শুয়ে আছে। এখন উপায় এ আবার কখন হলো। এখন কি করি মেয়েটির সাথে আমার না আছে প্রেম না আছে ভালোবাসা না আমার বিবাহিত বৌ কোন সম্পর্কেই সম্পর্কিত নয়। এ অবস্থায় কেউ দেখলে কি ভাববে হ্যায় আল্লাহ এ আমি কোন বিপদে পড়লাম এ কেমন মসিবত এসে গায়ে চেপে বসলো। মনের গভীর হতে রুহিতের কান্না পাচ্ছে। না পারছি

সরাতে না পারছি কাছে টেনে আদর করে বুকে জড়িয়ে নিতে। এমন সময় আলাল এসে স্যার ও স্যার আপনাদের ঘুম ভাঙেছে নাকি আরো ঘুমাবেন। নিজামের মা মর্জিনা আলালকে উদ্দেশ্য করে এই নিজামের বাবা ওদিকে কি হচ্ছে আপনার কি দিন দিন বয়স কমছে। উনারা স্বামী স্ত্রী উনাদের ঘুমাতে দেন। উনারা উনাদের ইচ্ছা মত উঠে দরজা খুলবে এতো হাঁক ডাকের কি প্রয়োজন। হ্যাঁ তুমি তো ঠিকই বলেছো আসলে আমার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। বলতে বলতে মর্জিনার কাছে এসে মোরগ, মাছ তুলে দিলে আলালকে প্রশ্ন করে আপনি এতো টাকা পেলেন কি করে রাতে বোধ হয় ডাকাতি করতে গিয়েছিলেন? রাগ করে মর্জিনা সকল কিছু ফেলেফুলে উঠে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করতে যাবে ঠিক তখন মর্জিনার হাত ধরে বিশ্বাস কর এই তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি আমি ডাকাতি বা চুরি পয়সায় এসব আনি নি। তুমি তো জানো ছেলেটা মরে যাওয়ার পর আমি ডাকাতি ডোকাতি ছেড়ে দিয়েছি। তাহলে সত্যি বলছো তুমি ডাকাতি করো নাই। তবে টাকা?
টাকা আমাকে বিয়ের বরযাত্রীরা জোর করে হাতে তুলে দিয়েছে রাতে আমি ওদেরকে ডাকাতদের হাত হতে রক্ষা করেছি বলে। বাকী কথা পরে বলবো তুমি মেহমানদের জন্য পাকশাক শেষ করে উনাদের খেতে দাও। উনারা সারা রাত মুড়ি গুড় খেয়ে আছে। আলালের একটি মেয়ে আছে। সে এখন মামার বাড়ি।
রুহিত আলাল এবং আলালের স্ত্রীর কথা শুনছিলো অন্যদিকে রুহিতের হাতের উপর কেয়া তাঁহার দুহাত দিয়ে জড়িয়ে আছে। রুহিত মনে মনে ভাবে রাজ রানী যেন আমার হাতকে বালিশ মনে করছে। ইস হাতটা ব্যথা করছে। রুহিত হাত কেয়ার হতে ছড়ানোর জন্য একটু একটু করে টানতে থাকলে হঠাৎ কেয়ার ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখে রুহিতের হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলো। তড়িঘড়ি করে উঠে হ্যাঁয় আল্লাহ আমি এখানে কেন আমারও তো একি প্রশ্ন কখন কিভাবে আমার পাশে এসে ঘুমিয়েছিলেন। কেয়া লজ্জায় রুহিতের কথার উত্তর দিতে পারলো না। বোকার মত কিছুক্ষণ বসে রইলো আর রুহিতের দিকে কেমন করে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। কেয়ার লজ্জা ভাঙানোর জন্য রুহিত বলল, আর এভাবে তাকিয়ে থাকতে হবে না যান বিছানা ছেড়ে উঠে হাত মুখ পরিষ্কার করে চলুন এ বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হই। দরজার খিড়কি খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই কেয়া দেখে আলাল সর্দারের স্ত্রী রান্না করায় ব্যস্ত। কেয়া পায় পায় হেঁটে রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালে আলালের স্ত্রী কেয়াকে একখানা পিড়ি এগিয়ে দিয়ে বসতে বললে কেয়া বসে পড়ে। অন্য দিকে রুহিত বারান্দাতে এসে দাঁড়ালে আলাল দৌড়ে এসে ছালাম দিয়ে স্যার আপনাদের বুঝি ঘুমাতে কষ্ট হয়েছে। আপনারা কত নরম নরম বিছানাতে ঘুমান। আরে নারে ভাই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যখন যে অবস্থাতে রাখেন তাতে শুকরিয়া আদায় করতে হবে। যাকগে আলাল ভাই চলুন আমাদেরকে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসেন।
আলাল, কি যে বলেন স্যার এখনই না, খাবেন দাবেন তারপর আমি নিজে গিয়ে আপনার বাড়িতে রেখে আসবো কারণ এ অবস্থাতে আপনাকে ছেড়ে দিলে আমার যে বড় ধরনের অকল্যাণ হবে। রুহিত আলালের ছেড়ে দেওয়ার কথা শুনে হকচকিয়ে উঠে। এ আবার কি বলে? স্যার আমি আপনাদের শহরের বাসাতে গিয়েছিলাম আপনার বাবা মা আমার গ্রামের নামের কথা শুনে কতই না যত্নাত্মি করেছেন, খাওয়ায়ে পরিয়ে একরাত একদিন রেখে কেস মীমাংসা করে তারপর হাতে বাড়িতে আসার ভাড়া, ছেলেমেয়ের বৌয়ের জন্য আলাদা টাকা হাতে দিয়ে বললো আলাল তুমি গ্রামে গিয়ে তোমার ছেলেমেয়ের কাপড় চোপড় কিনে দেবে। তাই সেদিনের সেই আদর আপ্যায়নের কথা আজও ভুলিনি। আলাল চোখের জল মুছতে মুছতে বলে আমি যখন না বলবো ততক্ষণ আপনাদের আমার বাড়িতেই থাকতে হবে। আলালের চোখের জল দেখে আর অনুরোধের জন্য আলালের নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষাতে রইলাম অজ্ঞাত বসবাসে পড়ে। আলাল উৎফুল্ল ফুরফরা মেজাজে উনুনের কাছে গিয়ে কি গো তোমার হলো। দেখুন আপা ঝড় বৃষ্টির কারণে উনুন ধরাতে দেরী হয়ে গেছে। আর বলে কিনা রান্না বান্না হলো। চুপচাপ করে গিয়ে বসেন আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি উতরে উঠা যায়। আলাল নিজ ঘরের দিকে পা রাখলে। আলালের স্ত্রী মর্জিনা কেয়াকে বলে আপা আপনার বাড়ি কোন গ্রামে আপনাদের বিয়ে হয়েছে কদিন। বিয়ে হ্যাঁ বিয়ে হয়েছে এ্ই গত কিছুদিন আমার গ্রামের বাড়ি সলপ ইউনিয়ন। এই সলপ ইউনিয়ন আমারও ঐ গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের পাশের গ্রাম। আপনার বাবার নাম কি। বাবা হাই স্কুল মাস্টার নাম ইমতিয়াজ খান। ও উনাকে তো চিনি উনি আমার স্যার ছিলেন। আমি ক্লাস নাইন পর্যন্ত উনার কাছে পড়েছি। জানি না স্যার আমাকে মনে রেখেছেন কি না তবে আমি স্কুলে কেরাত প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর ফার্স্ট হতাম বলে আমাকে আদর করে কত কি দিতেন। আলালের সাথে বিয়ে হওয়ার পর আর পড়া লেখা হয় নাই। কারণ আমার বাবা মা ভাই বোন তখন খুব গরীব ছিলেন। এখন হয়তো আল্লাহর ইচ্ছাতে কামাই রুজীর জন্য আগের তুলনায় খেয়ে পরে ভালোই আছেন। আমার একজন ভাতিজা আছে বরাবর ফার্স্ট হয় আপনার বাবার স্কুলে তাই শুনেছি বিনা পয়সায় উনি

না কি আমার ভাতিজাকে প্রাইভেট পড়ান। ভাতিজা আকবর মিয়া এবার মেট্রিকুলেট পরীক্ষা দেবে। বেশ আমি বাবার সাথে আলাপ করে জেনে নেবো। আপা আপনাকে তো আপনাদের গাঁয়ে কখনও দেখিনি। আমি কতবার গিয়েছি। আমি মামার বাড়ি থেকে পড়াশোনা করেছি মামার তো কোন সন্তান ছিলো না তাই মামা মামিকে দেখাশোনার জন্য মা বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। এখন আপনি নেই তবে উনাদের দেখভাল করছেন কে। বাড়িতে লোক রেখে দিয়েছি। কেয়ার কথায় বুঝা গেলো কেয়া কয়েক দিনের ছুটিতে এসেছে, ক'দিন নিজের বাড়িতে বাবার সাথে থেকে মামার বাড়ি হয়ে তারপর ঢাকাতে চাকরিতে জয়েন করার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে করতে মর্জিনার পাক শাক কমপ্লিট হয়ে গেলো। আলাল মর্জিনা কেয়া রুহিতের খাবারের ব্যবস্থা আলাদা ভাবে দেওয়ার কথা উঠলেও কেয়া আপত্তি জানিয়ে না আমরা একত্রে বসে খেতে পারি তার ব্যবস্থা করেন। আলালের ছেলে নিজামকে ডেকে বারান্দাতে চৌকির উপর বসে খাবার জন্য সকলেই বসলেন। মর্জিনা সব কিছু মানে মাছ, মাংস, ভাজি, ডাল একে একে করে এনে চৌকি ভরে দেয় তার উপর ভাত যেন বসার জায়গাই ছোট হয়ে পড়লো। আলাল নিজাম চৌকির উপর বসে আর রুহিত ও কেয়ার জন্য দুটি চেয়ারের ব্যবস্থা করলে ওরা চেয়ারে বসে খাবারের ফাঁকে ফাঁকে কথা বার্তা হয় এবং সবচেয়ে আলাল ডাকাতের সর্দার হওয়ার পেছনে কি কারণ তাই জানার আগ্রহ হলে আলালকে রুহিত প্রশ্ন করে প্রথমে বলতে চায় না কিন্তু আলালের স্ত্রী মর্জিনা বলে আপনি বলে দেন কেন ডাকাতির খাতাতে নাম লেখালেন। আলাল খেতে খেতে খাওয়া বন্ধ করে শুনবেন স্যার কেন ডাকাত হয়েছিলাম তার কারণ। ঘটনার সূত্রপাত হয় আমার বোনকে নিয়ে আমরা দুই ভাই এক বোন, বোনের নাম রাবিয়া। বোন দুই ভাই মধ্যে মেজো আর আমি ছোট। তবে আমার ছোট আরেক ভাই ছিলো সে মার্ডারের আসামী ছিলো পালাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তবে বড় ভাইও ঐ একইভাবে পুলিশের গুলিতে পরে নদীতে ডুবে নিজেই নিজেকে শেষ করে দেন।

বড় ভাই জোদদার পরিবারের সাথে পাটের ব্যবসা করতেন। সেই সুবাদে জোতদার আকমল হোসেনের সাথে পরিচয় একদিন আমার বড় ভাইয়ের নিকট আকমল হোসেন আসেন। এমন সময় এসেছিলো যে দুপুরের আগ মুহূর্তে তখন আবার বাবা মা দুজনে জীবিত। প্রকৃতপক্ষে পাটের ব্যবসাটা ছিলো বাবার এবং আকমল হোসেনের পূর্ব পুরুষের আমার বাবার সাথে সম্পর্ক এবং একত্রে পাট সরিষা আর অন্যান্য ব্যবসা থাকায় বাবার অবর্তমানে বড় ভাই তাদের সহিত সম্পৃক্ত হয়ে ব্যবসার হাল ধরেন। আকমল হোসেনের জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই খাবার দেওয়ার জন্য আকমলের সামনে আমার বোন রাবিয়া এলে রাবিয়াকে পছন্দ হয় এবং তার ছেলের জন্য রাবিয়াকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা উভয় পক্ষ গ্রহণ করে। তার দুদিন পর বিয়ের দিন ক্ষণ ঠিক করে আকমল খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ শেষে ভালই ভালই বিদায় নিয়ে চলে যান। পরদিবস আকমলের ছেলেকে সংবাদ দিয়ে উধনিয়া গ্রাম হতে করোতোয়া সাথে ফুল জোড়, ঝরঝরিয়া, কমলা দরগা ইত্যাদি নদী একত্রে বিভিন্ন স্থানে মিলিত হয়ে বিভিন্ন শাখা প্রশাখাতে রূপান্তরিত হয়ে তারই একটি উধুনিয়ার সাথে হাটি কমরুল গ্রামের সংযোগের মাধ্যমে নদীর উপর সেলু নৌকার দিয়া পাড়াপাড় হয়ে আকমলের ছেলে সামছুল জোতদার সরাসরি বাড়ি এসে উপস্থিত। আমার বড় ভাই ভাবী ব্যস্ত হয়ে বসা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে। সামছুল জোদ্দার বলে ব্যস্ত হওয়ার কোন দরকার নেই। বাবা বলেছে শুধু তোমার মেয়ে পছন্দ হয় কিনা দেখেই চলে আসবে। তাই কি হয় বোনকে দেখার উদ্দেশ্যে এসেছেন যখন খাওয়া-দাওয়া না করিয়ে ছাড়ছি না। তাছাড়া আজ বাদে কাল বিয়ে হবে। আপনি দেখতে এসেছেন তো আর আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। খাওয়া দাওয়া হলো এবং রাবিয়াকে সামছুল জোতদারকে দেখানো হলো। শুধু এইটুকুই বলে গেলো এতো সুন্দর মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লা। সামছুল বৌ দেখে খুশিতে আত্মহারা হয়ে রাবিয়ার হাতে কয়েকটি এক শত টাকার নোট গুজে দিয়ে চলে যায়। সামছুল জোতদার বাড়ি গিয়ে পৌঁছালে সকলেই জানতে চায় বৌ কেমন, উত্তরে বলে, আমার বাবার পছন্দ আছে মাশাল্লাহ। তাই তবে তো আগামীকাল তুলে আনতে হয়। খুব সুন্দর ভাবে বিয়ের কার্য সম্পন্ন হলে রাবিয়া শ্বশুর বাড়ি চলে আসে। এদিকে ভাই বা ভাবী মেয়ের মতো রাবিয়াকে দেখভাল করতো বলে বসে বসে কাঁদছে, হাজার হোক রক্তের সম্পর্ক। ভাবী ভাই কেন কাঁদছে আসলে তাদের কোন সন্তানাদী ছিলো না বলে রাবিয়াকে বোন হলে কি হবে নিজের মেয়ের মত লালন পালন করেছে। রাবিয়ার বিয়ে সাদী ধুমধাম করেই হয়ে গেলো। রাবিয়া তার শ্বশুরবাড়ি এবং অন্যান্যদের নিয়ে মাঝে মধ্যে আমি এবং বড় ভাই দুই তিন বার দেখে এসেছিলাম শুধু আমার বোনের প্রশংসা আর প্রশংসা যেন রাবিয়াকে পেয়ে স্বর্গ পেয়েছে। তাতে আমরা খুশি। আমরা আনার জন্য যতবার গিয়েছি ততবার হাসি মুখে বিদায় দিয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে এক বোন। আমার বিবাহর বয়স হলেও আমি বিবাহ করছি না। কারণ তিন/চার মাস হলো বোনের বিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে বড় ভাইয়ের অনেক খয়খরচা হয়ে গেছে যদি তারই মাঝে আমি বিবাহ করি বড় ভাইয়ের উপর অনেকটা চাপ পড়ে যায় বলে খানিকটা

বিলম্ব করছি। তার উপর আয় উপার্জন কিছু তখনও করি না বড় ভাইয়ের ঘাড়ের উপর বসে বসে খাচ্ছি বলে বড় ভাই ভাবী বিরক্ত তা কিন্তু নয় এভাবে চলছিল আমাদের এবং একমাত্র বোন রাবিয়া সংসার। হঠাৎ একদিন উধনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের ছেলে বাপি আসে তার বাবার পত্র নিয়ে আকমল জোতদারের কাছে। কিন্তু কথা নাই বার্তা নাই সরাসরি হনহন করে আকমলের ছেলে সাইফুলের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। তখন সামছুলের বৌ রাবিয়া বাড়ির উঠান ঝাড় দিচ্ছিলো। ফলে চেয়ারম্যানের ছেলে বাপির নজর পড়ে রাবিয়ার উপর এমন কুদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলো যে তখনই তুলে নিয়ে যাবে। রাবিয়া দৌড়ে ঘরের ভিতরে সামছুলকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে দেখতো তোমাকে কে যেন ডাকছে। সামছুল ঘরের ভিতর হতে বেরিয়ে এসে বলে আরে চেয়ারম্যানের পুত যে হঠাৎ সকাল সকাল আমার বাড়িতে হাতির পাড়া। আরে ইয়ার্কী মসকরা বাদ দে, শুনলাম তুই নাকি বিয়ে করেছিস কই আমাকে তো জানালি না। জানানোর কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। আচমকা সব হয়ে গেছে। যাক যেভাবেই হোক না কেন তা তোর নতুন বৌ-এর হাতের পাক কবে খাওয়াচ্ছিস। হবে একদিন তা কি মনে করে আকার ইঙ্গিতে চেয়ারম্যানের ছেলে বাপি বুঝালো তোর বাবা এলে বাবার এই পত্র খানা দিস কেমন, তা তোর বাড়ি এলাম নতুন বিয়ে করে এনেছিস। কই বৌ-এর হাতে এক গ্লাস পানি, সরবত ও দিয়ে আপ্যায়ন করলি না। বাপি কথায় লজ্জা পেয়ে বৌকে ডেকে এক গ্লাস লেবুর শরবত দেওয়ার জন্য বললে তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় করার জন্য লেবু শরবত এনে হাতে ধরতে রাবিয়ার হাতের উপর হাত দিয়ে এমনভাবে বাপি ধরে যে রীতিমত ব্যথা পাচ্ছিলো। রাবিয়া কোন ভাবে কষ্টে হাত ছাড়িয়ে নেয়। আর স্বামী সামছুল দেখতে পারে কিনা রাবিয়া চেয়ে দেখছিলো। মুহূর্তের মধ্যে এক অন্য রকম ঘটনা ঘটে গেলো। রাবিয়া দৌড়ে গ্লাস রেখে ভেতরে চলে যায় আর সামছুলের হতে বিদায় নিয়ে চেয়ারম্যানের ছেলে বাপি চলে গেলে সামছুল পরক্ষণে ঘরের ভিতর ঢুকে, কিরে দৌড়ে এলি যে, দেখেন ঐ ছেলে যেন এ বাড়িতে না আসে। তার চলাফেরা হাবভাব ভালো না। দেখ রাবিযা এ হলো এ এলাকার চেয়ারম্যানের ছেলে তাকে কিছু বলা যাবে না তার চেয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। দেখা যাক বাবা মা বাড়ি ফিরলে তাদের সাথে এ বিষয় লইয়ে আলাপ করে নেবো। কেমন লক্ষ্মী বৌ আমার। এরপর এ ছুতা সে ছুতা দিয়ে প্রায় প্রায় আসা যাওয়া। একদিন সামছুলের চেয়ারম্যানের ছেলে বাপির সাথে বাজারে দেখা, বাপির সাথে আরও দুই জন মেম্বারের ছেলে একত্রে বলে, কি সামছুল সুন্দরী বৌকে বাজারে নিয়ে আসলেতো আমরা তাকে শাড়ি আলতা কাচের চুড়ি কিনে দিতাম। বাপি এই কথা বলে সামছুল দেখ বাপি তুই আমার বন্ধু তাই তোর কথার উত্তর দিলাম না। আরে তোর না ঘরে বৌ আছে। কিন্তু তোর মত কচি মাল তো আর নেই। সাবধান বাপি ফাউল কথা বলবি না একেবারে জিহ্বাটা টেনে ছিড়ে নেবো। কি এতো বড় সাহস চেয়ারম্যানের ছেলের উপর চোখ রাঙানি ওই তো ধরতো শালারে বানিযে দেই। সামছুর কথাটা শুনে বাজার ছেড়ে দৌড়ে খালি জায়গাতে দাঁড়ালে ওরাও পিছনে পিছনে এসে উভয়দের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। পরে এক পর্যায়ে সামছুল কুলিয়ে উঠতে না পেরে মাটিতে পরে গেলে ওকে তুলে এনে স্কুল ঘরের পিছনে একটি কাঁঠাল গাছের সাথে বেঁধে ফেলে। বাপি আর ওর সহযোগীদের মধ্যে আলাপচারিতা হয় রাবিয়াক একা পেয়ে তুলে এনে স্কুলে সামছুলের সামনে ওরা তিন জন মিলে এমনভাবে অত্যাচার করে যে রক্ত ক্ষরণ হয়ে শেষ মেষে মারা যায়। যেহেতু সামছুল দেখেছে তাহলে তাকে কি করা যায় কিছুই করার নাই একটাকে মেরে বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া যাক আরেকটাকে নদীর কুলে বটগাছে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যাক। সেই ভালো তবে এখন নয় সন্ধ্যার পর এখন চল কোন ছুতা ধরে সামছুলদের বাড়ি যাই কি বলিস যাতে এর সাথে যে আমরা জড়িত আছি মানুষজন বা সামছুলের পরিবার বুঝতে না পারে। ওরা দুজন মাথা নেড়ে বাপির বাইকে বসে সামছুলদের বাড়ি আসে এবং ঠাণ্ডা মাথায় সামছুল সামছুল বলে ডাকতে ডাকতে উঠানে চলে এলে দেখে কেউ নেই। পরে জানা গেলো সামছুলের মা বাবা রাবিয়াদের বাড়ি গত দুইদিন আগে বেড়াতে গিয়েছে। আর সামছুল তার নতুন বৌ হয়তো পাশের কোথাও গেছে আপনারা বসুন আমি দেখছি জনৈক কাজের লোক বলে। না না তার আর দরকার হবে না আমি আগামীকাল আবার আসবো ওরা এলে আমার আসার কথা বলো কেমন। জ্বি ছোট চেয়ারম্যান। ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। এই দিন ভর আকাম কুকাম করে শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যে কথা সেই কাজ। কিন্তু ক্রিমিনালদের কোন না কোন সুরতাল থেকেই যায়। যখন রাবিয়াকে জোরপূর্বক শারীরিক নির্যাতন করছিলো তখন চেয়ারম্যানের ছেলের গলার একটি চেইন রাবিয়ার হাতে মুঠোতে আটকে যায় এবং বাপির গলা হতে ছিড়ে থেকে যায় তা বাপির মনেই নেই যে তার গলার চেইন নেই। এরপরে সামছুল এবং রাবিয়াকে জঙ্গলের পথ দিয়ে নদীর কূলে নিয়ে তখন কাছাকাছি তুহিন নামে এক দোকানদার দোকান হতে মল ত্যাগ করার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলো। ঠিক তখন ওদের টর্চের আলোতে দেখে চেয়ারম্যানের ছেলে আর মেম্বারের ছেলে। তিন জন মিলে দুটি লাশ নিয়ে নদীর কূলের দিকে যাচ্ছে তুহিন পিছু নেয় বিষয়টি

নিশ্চিত হওয়ার জন্য। সত্যি যে কথা সেই কাজ তুহিনের অনুমান সত্যি হলো কিন্তু অন্ধকারে লাশ দুটি যে কার তা আর বুঝতে পারলো না। তুহিন ভয়ের জন্য কেটে পড়ে, এইটুকু পর্যন্ত অপেক্ষা করে এই দুটি লাশ নিয়ে কি করে। অবশেষে দেখা গেলো একটা লাশ ভাসিয়ে দিলো নদীতে আর আরেকটি লাশ বটগাছে গলাতে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বাপিসহ ওরা দুজন চলে গেলো। সন্ধ্যার পর হতে বাড়ির কাজের ছেলে রিয়াজ রাবিয়া এবং সামছুলকে এ বাড়ি সে বাড়ি পাড়া মহল্লা ঘুরে যখন খুঁজে পেলো না তখন সামছুলদের বাড়িতে আস্তে আস্তে জানাজানির কারণে লোকজন জড়ো হতে থাকে। এক পর্যায়ে একজন বলেন সামছুলকে তো বাজারে দেখেছিলাম বাজার করে দুপুরে তবে বৌসহ সামছুল গেলো কোথায়। এ নিয়ে চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে যায়। সারা রাতভর রিয়াজসহ চাচাতো ভাইয়েরা এবং পাড়া পড়শী বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বেরিয়েছে। রিয়াজের ঘুম নেই খাওয়া নেই অবশেষে ঘর তালা দিয়ে রিয়াজ ভোর হওয়ার আগেই সামছুলের শ্বশুরবাড়ি যেখানে সামছুলের মা বাবা গিয়েছে সেখানে। ভোরের আগেই নদীর পাড়ে সেলু নৌকা বাধা তা নিয়ে হটিকুমরুল গ্রামে আসে এবং আকমল তার স্ত্রী, আলাল এবং বড় ভাই ও ভাবীকে জানালে তারা সকলেই সামছুলদের বাড়িতে আসে। তবে আলাল বাড়িটা দেখভাল করার জন্য পাশের বাড়ির চাচাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখে এসেছে। এরা বাড়ি আসার আগেই রিয়াজসহ সকলেই এসে দেখে বাড়ির উঠানে রাবিয়া এবং সামছুলের লাশ পড়ে আছে। ছেলে ও বৌ-এর লাশ দেখে হাউমাউ করে সকলে কেঁদে ফেলে। আলালের বড় ভাই, আল্লাহ গো আমার সহজ সরল বোনটাকে কে এতো বড় ক্ষতি করেছে। কাঁদতে কাঁদতে দেখতে পায় রাবিয়ার হাতের মুঠোতে কি না কি আছে সবাই অলকে হাত মুঠোটা চাপ দিয়ে দেখে একটি স্বর্ণের চেইন। বড় ভাই কাউকে বুঝতে না দিয়ে টপ করে পকেটে ভরে নেয়। পরক্ষণে বড়ভাই আলালকে ডেকে বলে, আলাল আমার সাথে আয়তো ভাই। আলাল আর বড় ভাই কাঁদতে কাঁদতে একে অপরকে গলা জড়াজড়ি করে বাইরের দিকে এলে বড় ভাই আলালকে বলে, দেখ ভাই আমার বোনকে অত্যাচার করে অবশেষে আসামী নিজেকে আড়াল করার জন্য নদীর ঘাটের বটগাছে গলায় রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে গেছে। শোন এই মৃত্যুর সাথে কেউ না কেউ জড়িত দেখ না বোনের হাতের মুঠি হতে এই চেইনটা পাওয়া গেছে। বল কি বড় ভাই আলালের উত্তরে একথা কাউকে বলা যাবে না। এমন কি পুলিশকেও না। আমার বোন এবং জামাইয়ের মৃত্যুর পেছনে কে কে আছে খুঁজে আমরা দুই ভাই নিজ হাতে বিচার করবো। ঠিক আছে ভাই এখন চল। বড় ভাই ও আলাল বোনের মৃত্যুর শোকে পাথর হয়ে গেছে। যে বোনকে ছোট বেলা হতে নিজের মেয়ের মতো বড় করে বন্ধুর পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে ছিলাম। আকমল আর আকমলের স্ত্রী একমাত্র ছেলের লাশ দেখে কাঁদতে কাঁদতে নিথর পাথর হয়ে গেছে। এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার চেয়ারম্যানের ছেলে বাপি সঙ্গে মেম্বারের ছেলের মধ্যে একজন দ্বিতীয় জন আসে নাই। বাপি এদিকে সেদিক তাকিয়ে বলে, কে এই কাজটা করেছে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে কি বলেন আব্বা। শুধু কি উপযুক্ত আমার মনে হয় স্কুল মাঠে গাছের সাথে ঝুলিয়ে একটু একটু করে লবণ দিয়ে তিলে তিলে মারা উচিত কি বলেন ওসি সাহেব। আমাদের দেশে এই আইন হলে তো ভালোই হতো তাহলে এ ধরনের ক্রাইম করতে ভয় পেতো। আমরা কেস সাজিয়ে গুছিয়ে কোর্টে পাঠাবো কি ভালো রকম সাক্ষী বা আই উইকনেস না থাকলে আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসবে। ছাড়া পেয়ে আবার যে লাউ সেই কদু। পোস্টমটেমের জন্য পাঠিয়ে দেই কি বলেন আপনারা। চেয়ারম্যান বলে তাছাড়া উপায় কি। নিয়ে যান ওসি সাহেব যত তাড়াতাড়ি কবরস্থ করা যায়। রাবিয়া এবং সামছুলের পোস্টমর্টেমসহ জানাজা কবর সবকিছুই হয়ে গেলো। আলাল বড় ভাই ভাবী নিজের গাঁয়ে ফিরে এসে ওরা তিন জনে আলাপ আলোচনা করে। বড় ভাই বলে থানা পুলিশ করে লাভ হবে না। মাঝখান হতে পয়সা অপচয় হবে। দেখি রাবিয়ার মৃত্যুর রহস্যের একটা প্রতিকার করতে হবে। বড় ভাই আলালকে বলে আমাদের এই অঞ্চল এবং রাবিয়ার শ্বশুরবাড়ির অঞ্চলে কে কে চুরি ডাকাতির সাথে জড়িত তাদের খুঁজে খুঁজে আমার কাছে নিয়ে আয়। বাকী পরিকল্পনা পরে ব্যবস্থা হবে। ঠিক আছে বড় ভাই। তুহিন নামে যে লোকটা দেখেছে সে এই মৃত্যুর পিছনে কে দায়ী তারই সন্ধান দিতে প্রায় প্রায় আকমল জোতদারের বাড়ি খোঁজ খবর নিয়ে যায় আলাল কিংবা তার বড় ভাই এসেছিলো কি না। কেন যে তুহিন আসছে তার বাড়িতে এতো কিছু আকমল জোতদার জানার চেষ্টা বা আগ্রহ নেই। তুহিন আলালের বড় ভাই এর প্রাইমারি স্কুল জীবনের বন্ধু তাই খোঁজ খবর রাখছে মৃত্যুর ঘটনাবলি জানাতে। আকমলের শোকাহত পরিবার ছেলে ছেলের বৌকে হারিয়ে তাই তেমন কারো সাথে মেলামেশা নাই, নেই কোন কথাবার্ত। শুধু রিয়াজ সময় সময় বাজার ঘাট করে দেয় আর কাজের মহিলা রান্নাবান্না করে দিলে কোন দিন মনে চাইলে খাওয়া দাওয়া করে কোনোদিন না খেয়ে উপোস থাকে। সুন্দর পরিবারের জীবনটা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তুহিনের দোকানে একদিন বাপি তার সহচরদের নিয়ে এসে আনন্দ ফুর্তি চা নাস্তা খেয়ে যায়। তুহিন এক ফাঁকে বাপিকে জিজ্ঞেস করে ভাতিজা দেখছি খুব ফুরফুরা

মেজাজেই আছেন। আচ্ছা ভাতিজা আপনাকে একটা কথা বলি কিছু মনে নেবেন নাতো। আরে না চাচা কি আর মনে করবো আপনি বলুন। আচ্ছা ভাতিজা আপনার গলায় সব সময় একটা লকেট যুক্ত চেইন দেখতাম এখন দেখি না। না ভাতিজা আপনি হলেন চেয়ারম্যানের পুত আপনার গলাতে চেইন না থাকলে ভালো দেখা যায়? আরে না চাচা আসলে চেইনটা ছিঁড়ে গেছিলো কর্মকারের নিকট পুনরায় ঠিক করতে দিয়েছি। কোন কর্মকারের কাছে দিয়েছেন, ভাবছি আপনার মত লকেট যুক্ত চেইন বানিয়ে আমার মেয়েকে দেবো। আপনার মেয়ের বয়স কত। কত আর হবে ৮/১০ বছর হবে। ছোট তো তাই মাঝে মধ্যে স্বর্ণের জিনিস পরার জন্য বায়না ধরে এর মধ্যে একজন এসে, তুহিন চাচা চা নাস্তা আছে। আছে আপনি বসুন আমি দিচ্ছি। তুহিন অন্য দিকে নিজেকে ব্যস্ত করে নেয় আর বাপির লোকজন নিয়ে পয়সা মিটিয়ে চলে যায়। বাপি বাড়ি এলে হঠাৎ তুহিনের কথা মনে পড়ে যায়, আসলে তো আমার চেইন কোথায়, তুহিন চাচার কাছে তো মিথ্যে কথা বলে এলাম। দেখি রুবিনা জানে নাকি। বাপি রুবিনাকে জিজ্ঞেস করে রুবিনা আমার গলার চেইনটা দেখেছো। রুবিনা আকাশ হতে মাটিতে পড়ে গেলো। হায় আল্লাহ আমি চোর না ডাকাত যে তোমার চেইন গলা হতে রাতের অন্ধকারে খুলে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখবো। শোন বাপি তুমিও যেমন চেয়ারম্যানের ছেলে আমিও কিন্তু চেয়ারম্যানের মেয়ে তাই বলছি আমাকে কথা বলার আগে খুব হিসাব করে কথা বলবে। বাপি, আরে ভাই একটু না হয় জানতে চেয়েছি তাই এতো কথা। বাপির কয়দিন আগের কথা মনে পড়ে যায় রাবিয়াকে শারীরিক অত্যাচারের কথা মনে হলো যে রাবিয়ার তার সাথে ধস্তাধস্তির সময় ছিঁড়ে গেছে দেখি খোঁজ নিয়ে। দ্রুত বেরিয়ে পড়ে আর পেছন হতে রুবিনা ডাকতে থাকে শোনে যায়। কিন্তু বাপি রুবিনার ডাকে সারা না দিয়ে স্কুল ঘরের পেছনে এসে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে বাইক নিয়ে যে পথে রাবিয়া আর সামছুলকে নিয়ে গেছে সেই পথে। এলো বটগাছ তারপর নদীর পার কোথাও চেইন খুঁজে না পেয়ে মেম্বার-এর ছেলেদের কাছে গিয়ে জানতে চায় চেইন পেয়েছে কিনা। ওরা অস্বীকার করে তবে গেলো কোথায় মেম্বারের ছেলে বলে সেই কবে আজকে প্রায় দুসপ্তাহ হয়ে গেছে হয়তো কারো হাতে পড়েছে। তাই হবে হয়তো। তবে আমি তুহিন চাচার কাছে বলে এসেছি চেইনটা ছিঁড়ে গেছে কর্মকারের দোকানে মেরামত করতে দিয়ে এসেছি। মেম্বারের ছেলে বলে, কি সর্বনাশের কথা বলেছিস শোন বাপি আর দেরী নয় এখনি চল কর্মকারের দোকানে গিয়ে চেইনটা বানাতে দেই। তাই চল ভাই, যদি বাবা মা জানে তাহলে কেলাঙ্কারির শেষ নাই। তোর বৌ, তাকে এখনি গিয়ে মুখ বন্ধ করে দেবো। বাপি হুবহু গলার চেইন কর্মকারের দোকান হতে বানিয়ে গলায় পরে প্রথমে তুহিনকে পরে রুবিনাকে বলে যে চেইন পেয়ে গেছি। তুহিন বাপির গলার চেইন দেখে খানিক খুশি হলো। কারণ এভাবেই বন্ধু তার বোন ও বোনের স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হবে।

বড় ভাই হাফিজ সর্দারের নাম বাদ দিয়ে রুস্তম ডাকাত নামকরণ করে ডাকাতদলের প্রধান হলেন আর আলালের নামসহ গ্রাম হতে ডাকাত দলে আসাতে তাদের নাম পরিবর্তন হলো। পনেরো সদস্যের একটি ডাকাত দল গঠন করে তারা যারা অত্যাচারী, জোতদার বড় বড় ঘরবাড়ি টাকা পয়সার অভাব নেই তাদের খুঁজে খুঁজে জোরপূর্বক ধনরত্ন টাকা পয়সা লুট করে গরীব দুঃখীদের মধ্যে গোপনে ডাকাত সদস্য ব্যতিত বিশ্বাসী জনসাধারণ দিয়ে বিলি বণ্টন করতে থাকে। এরমধ্যে নির্দিষ্ট একটা গোপন স্থান বেছে নেয়, যে যেখানেই থাকুক না কেন ডাকাতির আগে পরে গোপন আস্তানাতে উপস্থিত হবে। দিনের বেলাতে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে খোজিলদার গণ গিয়ে খোঁজখবর নেয় রাত্রি হলে অপারেশন শুরু হয় এইভাবে চলতে থাকে মাসখানিক। একদিন আলালের (লালু) দল ছুট হলে বিপদে পড়ে রাতের অন্ধকারে সলপ ইউনিয়নের ঝিকরা গ্রামে মর্জিনাদের বাড়িতে আত্মগোপন করলে, মর্জিনা আলালকে দেখে ঘুম ভেঙে চিৎকার দিতে যাবে তখন তাৎক্ষণিক আলাল মর্জিনার মুখ চেপে ধরে চুপচাপ বসে থাকতে বলে একটু সামান্যতম চিৎকার চেঁচামেচি করলে একেবারে টুস করে দেবো রিভালবার দেখিয়ে। আর বলে শোন আমরা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেই না এটা আমাদের ডাকাত সর্দারের নির্দেশ। এ যে আমার মুখে যে হাত দিলে তা তোর কারণে তা না হলে তোকে মুখ ধরার প্রয়োজন ছিলো না। মর্জিনা বলে ডাকাত হলেও আপনাদের সততা রয়েছে ভালো। পুনরায় মর্জিনাকে বলে দেখ মেয়ে আমি তোর নাম জানি না তবে বলি আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। যদি তোদের ঘরে ভাত, মুড়ি, চিড়া যা কিছু, আমাকে খেতে দে। আলালকে দেখে মর্জিনা মুগ্ধ হয়ে বলে যে এতো সুন্দর দেখতে ছেলে মানুষ হয়। আবার আলালেরও একই কথা এতো অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। আলাল, কই তোকে না বললাম কিছু খেতে দে দুদিন হয় কিছুই পেটে পড়ে নাই। মর্জিনা ঘর হতে বেরুনের আগে আলাল বললো, দেখ মেয়ে বেশি কিছু চালাকি, করবি না তাহলে তোদের ঘর বাড়ি তোদের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবো। ইস বীর পুরুষ মর্জিনা হাসি দিয়ে ঘর হতে রন্ধনশালাতে নিয়ে ভাত খাবার নিয়ে আসে। কোন ভাবে খেয়ে দেয়ে সব বিষয়ে মর্জিনার সাথে আলাপ শেষে রাত্রি যাপন করে আযান দেওয়ার আগে চলে যায়, যাবার আগে মর্জিনাকে বলে,

আবার দেখা হবে। সবাই গোপন অবস্থানে আলালের জন্য অপেক্ষা করছেন আলাল (লালু) গোপন অবস্থানে পৌঁছালে নিশ্চিন্ত হয়ে যার যার কর্মপরিকল্পনা দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। বড় ভাই রুস্তম সর্দার আর আলাল (লালু) সর্দার বাড়ি এসে কিছুক্ষণ অবসর গ্রহণ করার পর বড় ভাই স্ত্রী খাবারের জন্য ডাকলে দুই ভাই একত্রে খাবারের জন্য বসলে বড় ভাবী জানতে চাইলো, তোমরা রাবিয়ার মৃত্যুর রহস্য খুঁজে পেয়েছো কে ওদের মেরেছে। বড় ভাই বলল, না এখনও হদিস পাই নি। তবে অচিরেই পেয়ে যাবো। তবে আসামীর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি শুধু প্রমাণের অপেক্ষা। বড় ভাবী রাগান্বিত স্বরে, বেশ ভালো তবে যত তাড়াতাড়ি পারো ডাকাতের খাতা হতে বেরিয়ে আসো। বড় ভাবীর কথা শেষ হতে না হতে ভাবী তোমাদের একটা কথা বলি। আমার একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। সলপ ইউনিয়নের ঝিকরা গাঁয়ের মেয়ে। তোমরা প্রস্তাব নিয়ে আমার সাথে মর্জিনার বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। মেয়েটি কি দেখেছিস বড় ভাইয়ের কথার উত্তরে তোমাদের পছন্দ হবে। ঠিক আছে আগামীকাল চল। আলালের বিয়ের জন্য দুইদিন ডাকাতি করার পরিকল্পনা স্থগিত করে দেওয়া হইলো এবং ডাকাত দলের সকল সদস্যকে জানিয়ে দেওয়া হলো। আসলে আলালদের পূর্ব পুরুষ পাট, ধান, সরিষা গমের ব্যবসার সাথে জড়িত এবং সর্দার বাড়ি হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত। বিধায় মর্জিনাদের বাড়িতে হটিকমরুল জায়গার সর্দার বাড়ির নাম শুনলে যে কারও মেয়ে দিতে ইচ্ছা পোষণ করবে। সকাল হতে না হতে লোক মারফত মর্জিনাদের বাড়িতে মিষ্টিমণ্ডা নানা জাতের ফলমূল দিয়ে পাঠানো হলো। মর্জিনার বাবা আশ্চর্য সর্দার বাড়ি হতে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসায় মর্জিনার বাবা বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং দুপুরের মধ্যে আসার জন্য বলে দেয়। সে মতে মর্জিনাদের বাড়িতে উপস্থিত হলে বড় ভাই মেয়েকে দেখে পছন্দ করে এবং আলালের সাথে বিয়ে হয় এবং মর্জিনার বাবার যে অর্থ খরচ হয়েছে তার চেয়ে বেশি টাকা হাতে তুলে দিয়ে আসে বড় ভাই হাফিজ সর্দার ওরফে রুস্তম ডাকাত। মর্জিনার সাথে বাসর ঘর করার আগে মর্জিনার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে তার বোন রাবিয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার পর ডাকাতি করা ছেড়ে দেবো। আলাল ও মর্জিনার কথায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। পরদিন বড় ভাই রুস্তম ব্যবসার কাজে গঞ্জে রওনা হবে কি সেই সময় বাল্যকালের বন্ধু তুহিন শেখ বাড়িতে এসে উপস্থিত। কিছুটা চা নাস্তার মিষ্টি মণ্ডার ব্যবস্থা করা হলো। তুহিন রুস্তমকে বলে বন্ধু তোমার সাথে আমার দুটি কথা আছে তোমার বাড়ির বাইরে এসো আমি আবার তোমার বাড়ি ছেড়ে খালুর বাড়ি যাবো খালার নাকি বেশ বিমার। আচ্ছা চল বাংলো ঘরে। তুহিন বাংলো ঘরে গিয়ে বড় ভাইয়ের সহিত ফিসফিস করে বলে ঘর হতে বেরিয়ে আসার পথে বড় ভাই শুধু এতটুকুই বলো তাই। তুহিন সত্যি না হলে এতো দূর এসেছি নদী নালা খাল বিল পেরিয়ে। আমি নিজ চোখে দেখেছি তাছাড়া গলার চেইন হলো বড় প্রমাণ যে চেইন হারিয়েছে যা তোমার কাছে আছে সেই চেইনের হুবহু আরেকটি চেইন বানিয়ে নিয়েছে। বেশ ভালো তাহলে তো চেয়ারম্যানের রক্ষা নেই নেই মেম্বারের দুই পরিবারের। যাই হোক তুহিন খবর দিয়ে চলে গেলো খালুর বাড়ি আর বড় ভাই গঞ্জে গেলো ব্যবসার কাজে। বড় ভাই গঞ্জের হতে সন্ধ্যায় দিকে ফিরে এসে সকল ডাকাত সদস্যকে আলালসহ খবর দিলো আজ রাতে যেখান গোপন আস্তানা আছে সেখানে উপস্থিত থাকতে। ডাকাতের সকল সদস্য যথারীতি গোপন আস্তানে একে একে করে হাজির হলে বড় ভাই রুস্তম সকলের সাথে কথা বিনিময় করে বলে তবে আগামীকল্য সন্ধ্যার পর চেয়ারম্যান বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবো। তার আগে বাড়ির যত যাবতীয় লুট এবং পরে আগুন। কথা আর কাজ, কথা মত হয়ে গেলো প্রথম লুটতরাজ পরে বাপিকে রশি দিয়ে বেধে টানতে টানতে নদীর কূল এবং সেই সাথে বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে চেয়ারম্যানকে পায়ে গুলি দুহাত কেটে গাছের সাথে ঝুলিয়ে, দেখেছিস তোর ছেলের জন্য আজ তোর এই অবস্থা তুই যদি ছেলেকে শাসন করতি তবে তোর ছেলে খারাপ হতো না। নদীর কূলে তোর ছেলের লাশ পড়ে থাকবে তোর লোকজন দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসিস ধর আমি একজনের দায় মুক্ত হলাম। পরক্ষণে বাপির স্ত্রীর রুবিনার কাছে এসে আমি জানি তুমি স্বামী হারা হবে কিন্তু আমার কিছুই করার নেই শুধু এইটুকু বলবো দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল থাকা ভালো। তোমার স্বামী একজন চরিত্রহীন রাবিয়া নামের মেয়েটিকে শারীরিক অত্যাচার করতে করতে মেরে ফেলেছে এতেও ক্ষান্ত হয় নাই। পরে আবার বটগাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলো এবং তারস্বামীকে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। কারণ আমরা মেয়েদের গায়ে হাত দেই না। তাই তোমাকে বলছি ভবিষ্যতে তোমার বাবাকে বলে আবার বিয়ে করে নিও। তোমাকে যে এতো কথা বললাম কাউকে বলবে না। বললে তোমার স্বামীর দশা তোমারও হবে। আমার নাম রুস্তম ডাকাত। রুস্তম ডাকাত চেয়ারম্যান বাড়ি ত্যাগ করে এবং নদীর ঘাটে এসে বাপিকে বটগাছে ঝুলিয়ে ফাঁস দিয়ে মেরে নিশ্চিত করে রেখে গেলো। চেয়ারম্যান বাড়িতে লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। নানা জনে নানা মতামত ব্যক্ত করে বাপ বেটার পাপের জন্য এখন বাড়ি সুদ্ধ ভোগ করছে। কি দরকার ছিলো নিজের লোভ লালসা করার। আবার অনেকেই বলে আল্লাহ জানে কি কারণে চেয়ারম্যান তার ছেলে বাড়ি ঘর এতো বড় শাস্তি ভোগ করলো। বাড়ি ঘর পুড়ে যখন শেষ

ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ ঘণ্টা দেড়েক পর পুলিশের লোক এলো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে পুলিশের কিছু করার নেই। বাপিকে পোস্টমর্টেম করার জন্য নিয়ে গেলো, নিয়ে গেলো চেয়ারম্যানকে চিকিৎসার জন্য এবং পুলিশ ঘটনার প্রত্যক্ষকারীদের নিকট হতে কিছু তথ্য লিখে সেই সাথে বাপির মা ও স্ত্রী রুবিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেলেন। চেয়ারম্যান বাড়ির যে অবস্থা চেয়ারম্যানের স্ত্রী ও ছেলের বৌ রুবিনা নির্বাক দৃষ্টিতে ছাইভষ্মের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কালমত ঘর বাড়ি। পর দিবস উল্লাপাড়া প্রত্যেকটি ইউনিয়ন গোপনে গোয়েন্দা নামিয়ে কোণায় কোণায় সার্চ করে কোন প্রকার এই ডাকাত বা মার্ডারকারীদের হদিস বা তথ্য খুঁজে পেলো না। এ যেন রহস্যের চাদরে ঢাকা পড়ে আছে। পুলিশ প্রশাসন খুবই চিন্তায় পড়ে গেলো। এই ডাকাত দলের চুরি বা ডাকাতি মার্ডার হতেই চলেছে।
বেশ কিছু দিন বড় ভাই ও তার দল বল গা ঢাকা দিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখে পুলিশ প্রশাসনের তৎপর নিরব হওয়ার পর পুনরায় খোঁজ খবর নিয়ে বড় ভাই রুস্তম সর্দার গোপন আস্তানাতে আগামী দিনের রাত্রির পরিকল্পনা নিয়ে বসে সকল ধরনের ফয়সালা হলো যে, এক সাথে দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুই মেম্বার বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া এবং লোকসহ ওদেরকে একই অবস্থাতে গাছে ঝুলিয়ে মারা। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে একই ভাবে চেয়ারম্যানের ন্যায় মেম্বারের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়ে লুট করে যাবার সময় দুই মেম্বারের হাত দুটি কেটে গাছের সাথে ঝুলিয়ে রেখে ছেলে দুটিকে নিয়ে বটগাছে মেরে ঝুলিয়ে রেখে দুটি সেলু নৌকায় দু দলে ভাগ করে রওনা দিতে একটি সেলু নৌকা ঘুরাতে গিয়ে সেলুর ইঞ্জিন স্টার্ট না নেয়ায় একটি সেলু নৌকা চলে যায় আর রুস্তমের নৌকা নদীর পাড়ের কাছাকাছি থাকাতে পুলিশ চলে এসেই প্রথমে ধরা দিতে বলে পরে অতর্কিত গুলি ছুড়তে থাকে। বড় ভাই হাফিজ ওরফে রুস্তম হুতি দিয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি গুলি রুস্তমের গাল বরাবর ভেদ করে চলে গেলো রুস্তম সবাইকে বলে আমি যদি তোদের সাথে যাই তবে আমাকে চিনে ফেলবে এবং আমার বংশের গায়ে কলঙ্ক লাগবে। অবশেষে ভাই আমার তোর ভাবীকে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়ে বলিস আমি আমার বোনের প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। তোরা প্রতিজ্ঞা কর আজকের পরে কেউ ডাকাতি করবি না, কারও ধনদৌলত লুট করবি না, কারো গায়ে হাত তুলবি না। আমাদের যা আছে তাই নিয়ে ব্যবসা অথবা পারলে রিকসা চালিয়ে চলবি। এই বলে নদীতে ঝাঁপ দিতেই নদীর স্রোতে ভেসে যায়। সকলে সর্দার বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে সেই সাথে সেলো মেশিনের নৌকা স্টার্ট নিলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। এতো রাত্রিতে ঘাটে বা আশেপাশে কোন সেলো বা নৌকা না থাকায় পুলিশগণ বড় ভাই রুস্তম এবং অন্য সেলো নৌকা ধরতে সক্ষম হলো না। পরদিবস প্রত্যেকটি গ্রাম তল্লাশী করে কোন ডাকাত দলের সদস্যদের সন্ধান পেলো না। তাছাড়া বড় ভাই রুস্তম যে কোথায় কোন কূলে ভেসে গেছে তার আর হদিস কেউ পেলো না। বেশ কিছু দিন সর্দার বাড়িতে শোকের ছায়া লেগে রইলো। তারপর একদিন বড় ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেলেন, তার কিছুদিন পর আমার একমাত্র ছেলেও হঠাৎ এমন অসুস্থ হলো যে তাকে আর মৃত্যুর হাত হতে ফেরানো গেলো না। কিছুদিন পর আমার এই ছেলে নিজামের জন্ম হলো আমিও ভালো পথে চলার চেষ্টা করলাম। আমি বড় ভাইয়ের মত ব্যবসা ধরে রাখতে পারলাম না। একের পর এক লোকসান হতে থাকে পরে তিনজনের সংসারে অবশেষে সর্দার বাড়ির ছেলে হয়ে ভ্যান রিকসা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। আসলে রাগের মাথায় প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বুঝতে পারলাম অপরের ধন দিয়ে সুখ হয় না। তাছাড়া অভিশপ্ত কাল নাগিনীর মত একের পর দংশন করতে থাকলো। অবশিষ্ট যা আছে বর্তমানে তা হয়তো আমার নেককার স্ত্রীর জন্য আর কোনোদিন ভালো কাজ কিছু করেছিলাম সেই জন্য আল্লাহর রহমতে এখনো টিকে আছি। সর্বশেষে এইটাই বলবো কেউ যেন আইন হাতে তুলে না নেয়। আইন সত্য হোক আর মিথ্যা হোক আইন আইনের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাহলে কোনো প্রকার বিপদ নিজের ঘাড়ে চেপে বসে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হবে না। রুহিত আলালকে প্রশ্ন করলো আপনি যে ডাকাত দলের সহিত জড়িত ছিলেন কেউ কি তা জানে। না জানে না কেউ কোন দিন আমাদের মুখ পর্যন্ত দেখে নাই। শুধু বাইরের একজন বড় ভাইয়ের বন্ধু তুহিন আর আমাদের মধ্যে আমরা তিনজন এবং যে কজন ডাকাত দলের সদস্য ছিলো, তারা আবার অনেকেই মারা গেছে। আমাদের না চেনার কারণ সে সময় কারো আসল নাম ব্যবহার করা হতো না। সকলেই ছদ্ম নাম ছিলো। কেয়া হেসে বলে, এখন আপনার সব কথা শুনলাম জানলাম এখন যদি পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেই? দিলে তো আর কিছু করার নেই, আমি ভাববো এ আমার পাপের শাস্তি। কেয়া বলল, ইয়ারকি করলাম তবে শুনে খুশি হয়েছি যে এখন আর কোনো পাপ অন্যায় কাজের সাথে নেই। খাওয়া দাওয়া কথা বার্তা শেষ করে রুহিত ও কেয়া বিদায় নেবে। বিদায়ের প্রাক্কালে রুহিত আলালের স্ত্রী মর্জিনার হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার একখান চেক তুলে দিয়ে বললেন, ভাবী এইটা দিয়ে নিজামের পড়াশোনা আর আলাল ভাই যেন ভ্যান চালানো বাদ দিয়ে ছোট খাটো ব্যবসার কাজ শুরু করেন, মনে করবেন আমি আপনার ভাই, ভাই হয়ে বোনের পাশে সর্বক্ষণের জন্য দাঁড়ালাম।

আলাল ও মর্জিনার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। রুহিত আবারও বললো, আপনাদের জন্য আমার দরজা সর্বক্ষণের জন্য খোলা আছে যদি লজ্জা না করেন। আসলে আমি এসেছিলাম আমার গ্রামের মানুষকে মোটিভেশন করে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই সূত্রে আপনাদের দিয়ে আমার প্রথম শুরু হয় হাতেখড়ি। সকলের হতে কেয়া রুহিত বিদায় নেওয়ার পর নিজ নিজ গ্রামে ফিরে এলো। কিন্তু দেখা গেলো না রুহিত কেয়াকে রেখে যেতে পারছে, না কেয়া রুহিতকে ছেড়ে দিতে চাইছে। শুধু রুহিত যেতে যেতে উদ্দেশ্য করে বলে আবার হয়তো দেখা হলেও হতে পারে। রুহিত কেয়া হতে বিদায় নিতেই যেন কেয়ার মুখখানা কালো হয়ে এলো। সেই সাথে মনের ভিতরটা খচখচ করছে। মনে হলো রুহিতকে চোখের আড়াল করে ভুল হয়েছে। কেন ধরে রাখিনি। তবুও যেতে দিতে হবে কারণ রুহিত তো আমার কেউ না। কেন রুহিতের কথা চিন্তা করছি। না আমার মাথায় কি রুহিতের প্রেতাত্মা ভর করেছে। কেয়া ভ্যান হতে নেমে ইতোমধ্যে নিজের বাড়ির রাস্তাতে পা রাখলো। কেয়া বাড়ি এসে ভাই বোন বাবা মা পেয়েও কেমন যেন শূন্যতায় থেকে রইলো।

রুহিত তার নিজ বাড়ি নিজ গ্রাম উধনিয়া এলে আশেপাশের লোকজনের ভিড় জমে যায়। রুহিতের জন্য একেক বাড়ি হতে একেকজন নানান কিছু খাবারদাবার নিয়ে এলো। রুহিত এসব দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো। রুহিত বিদেশ থেকে মানুষ কিন্তু এখনো বিদেশী কায়দা কানুন চলাফেরা গায়ে লেগে আছে। তাই হয়তো অস্থিরতাতে ভুগছে। অনেকের অনেক কথার মধ্যে শুধু এইটুকু জানালেন আপনারা সবাই আগামীকাল আসবেন আপনাদের সাথে অনেক কথা বলবো। আমি আপনাদের জন্য অনেক কাজ নিয়ে এসেছি। আজ আমাকে ছেড়ে দিন আজ শুধু আমি ঘুমাতে চাই। সকলে বলল, বেশ বেশ। রুহিত হালকা পাতলা খেয়ে দেয়ে বিশ্রামে অকস্মাৎ ঘুমের মধ্য দিয়ে স্বপ্নে দেখে কেয়াকে। দেখে কেয়া রুহিতের পাশে ঘুমাচ্ছে। রুহিত দ্রুত ঘুম হতে উঠে কেয়াকে খুঁজতে থাকে ফলে অবশেষে নিজ মনে মনে আরে ধ্যাত আমি তো স্বপ্নে দেখছিলাম। আচ্ছা বলতে পারেন কেন কেয়াকে মনে হচ্ছে বারবার। আচ্ছা বলতে পারেন কেয়ার সাথে সম্পর্ক হলে কিংবা কেয়ার যদি জীবন সঙ্গী করে নেয় তবে কি ভালো হবে। কল্পনা হতে উত্তর আসে তুই তো কেয়ার সাথে তোর বুকে নিয়ে অজ্ঞাত বসবাসে রাত্রি যাপন করেছি। তাই না কেয়া তোকে ভুলতে পারবে না তুই ভুলতে পারবি। স্মৃতি তো স্মৃতিই। তুই এক কাজ কর কেয়াকে তুই তোর বৌ হিসাবে গ্রহণ করে নে। আমার মনে হয় তোর পরিবার কেয়াকে দেখে অপছন্দ করবে না। মনে হয় কেয়াকে তোর বাবা মা বৌয়ের মর্যাদা দেবে। কথা শেষ হতে না হতে কল্পনার জগৎ রুহিতের ভেঙ্গে যায়। আবার সারা বেলা ঘুম হলো না। সন্ধ্যাতে বাড়ির পাহারাদার এসে বলে ভাইজান আপনাকে চা দেবো, হ্যাঁ দাও, চা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হবে ভালোই লাগবে ।পাহারাদার বিরু চলে গেলে কেয়া চুপিচুপি অন্যপথ দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখে বিরু চা তৈয়ারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিরুকে মুখে আঙ্গুল দিয়ে বলে চুপ। দাও আমি তোমার ভাইজানের জন্য চা নিয়ে যাই। বিরু বলে আপা আপনি কে? আমি কে আমি আমি তোমার ভাইজানের....। ও বুঝেছি। তা আপনি এতো দেরী করে এলেন যে? কি আর করবো ভাই তোমার ভাইজান আমাকে রেখে চলে এসেছে। ও বুঝছি ভাইজান অভিমান করে তাহলে এখানে চলে এসেছেন। হ্যাঁ তাই হয়তো হবে। আচ্ছা আমি অন্য কাজ সেরে নিই আমার মা এসে রাতের রান্না করে দিয়ে যাবে। তোমার মাকে বলো আমার জন্য যেন রান্না বান্না করেন। তাতো করবেন সে কথা কি বলতে। বিরু হাসতে থাকে। কেয়া দরজার আড়াল হতে ট্রেতে করে চা নাস্তা নিয়ে উপস্থিত হলো রুহিতের সামনে। রুহিত মুহূর্তের মধ্যে কেমন যেন হয়ে যায় সেই হাত সেই সোনার চুড়ি সেই ঘড়ি দেখে। রুহিত বলে কে আপনি, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে? কেন ভিতরে আসুন। কেয়া কোন কথার উত্তর না দিয়ে আরেকটুকু হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতের ইশারাতে নিতে বলে। রুহিত আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে গিয়ে কেয়ার হাত ধরে টান দিয়ে কাছে নিয়ে এসে বলে আপনি এই সন্ধ্যা বেলায়। কেয়া বলে আপনি নয় বলো তুমি। বিশ্বাস কর রুহিত একটা মুহূর্ত তোমাকে ছাড়া আমার কাটছিলো না। যেন তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তাই বলে এতো রাতে আগামীকাল তো আমিই যেতাম তোমার কাছে। আমারও না তোমাকে ছাড়া একটা ঘণ্টা একটা মিনিট সেকেন্ড কাটছিলো না, একদিনের দেখাতে কি যে যাদু কি যে তোমার গায়ের গন্ধে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না। এইমাত্র এই একটু আগেই তোমাকে নিয়ে স্বপ্ন এবং কল্পনা করছিলাম। তাই! তবে তুমি তোমার করে নাও আমিও তোমাকে সারাজীবনের জন্য পেতে চাই। তোমাকে যে আমি হারাতে চাই না তুমি আমার হতে হারিয়ে গেলে আমি হয় পাগল হবো না হয় মরে যাবো। রুহিত তুমি বসো না, নাস্তা কর তারপর আমি আর বিরু গিয়ে তোমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। কেয়া সত্যি তুমি আমাকে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যাবে একি আমার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। ধরে নাও হতে পারে রুহিত চা নাস্তা পরে দুজনে খাবার খেয়ে চলে যেতে যেতে কথা বলাবলি করছে। বিরুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরুতে বিরুর মা এসে দাঁড়িয়ে তুমি

বলতেই কেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি এ বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাচ্ছো মা। যাচ্ছি বাবার বাড়ি। অন্যদিন, কেন মেমসাহেব তুমি আজ না হয় ভাইজানের সাথে থেকে যাও। বাড়িতে চিন্তা করবে, না বলে কয়ে এসেছি। তোমরা সাহেবকে দেখে রেখো কেমন। আমার বাড়ি বেশি দূরে নয় সলপ গ্রামে এই গ্রামের শেষ মাথায়। কেয়া, রুহিত আর বিরু রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে একটা ভ্যানগাড়ি এসে উপস্থিত হলে ভ্যান গাড়িকে বলে ভাই আমরা সলপ ইউনিয়নের এই গাঁয়ের শেষ মাথাতে যাবো। সে কথা আর বলতে হবে না আমি আপনাকে সকালবেলায় দেখেছি। ভ্যানওয়ালা চলতে থাকে। আজ আকাশে এতো তারার মেলা বসেছে যে কল্পনাতীত। সারা গ্রাম জোসনার আলোতে খা খা করছে। এতো তীব্র আলো আগে কখনো দেখিনি। আর দেখবোই বা কি করে কখনো কি আজকের মত শহর আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছি। বাল্বের আলোতে আকাশ তো দূরে থাক কোন কিছুই দেখা যেতো না। রাস্তাতে কথায় কথায় কেয়াদের বাড়ির সামনে ভ্যান এসে থামলে কেয়া রুহিতকে বাড়িতে নেয়ার আহ্বান জানালে রুহিত বলে, আজ নয় তাছাড়া একদিন তো যেতেই হবে। কি বলে তুমি আবার বলো। যাকগে শোন নাই যখন আর দ্বিতীয় বার না শোনাই ভালো। কার্যতে প্রমাণ পেলেই হলো। বলে তুমি যাও আমি আসি। কেয়া বলে না আগে তুমি ফিরে যাও আমি তারপর বাড়ি যাবো। দুজনের মধ্যে এমন ধরনের কথা হলে বিরু বলল, আসার কি দরকার ছিলো ভাবী আমাদের বাড়ি চির দিনের মত থেকে গেলেই পারতেন। ভাবী এক কাজ করেন আপনি আবার আমাদর সাথে চলেন। (বিরুর কথায়) তোমার ভাইজান আমাকে নিয়ে গেলে তো, দেখলে না কত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলেন। আসলেই তো আমি তা ভেবে দেখিনি ভাইজান আপনি ভারী অন্যায় করেছেন ভাবীর সাথে। রুহিতের মুখ চোখ লাল হয়ে আসে বিরুর কথা শুনে। শোন কেয়া সাবধানে থেকো। তুমিও এই বলে একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকিয়ে বিদায় নিলো। এক দুদিনের পরিচয়ে এখন এমন একটা অবস্থাতে পরিণত হয়েছে যে সেই প্রখ্যাত কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বলতে হয় 'যেতে নাহি দেবো হায় তবু যেতে দিতে হয়।'

রুহিতের কথা মত গ্রামের ছোট বড় অনেকেই রুহিতের বাড়ির উঠানে এসে উপস্থিত। রুহিত ঘর হতে বাইরে এসে সকলের উদ্দেশ্যে বলে, দেখুন আপনাদের যে কারণে এখানে আসার কথা বলেছি তা হলো এই গ্রামে আমার বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ জন্মেছে। তাই তাদের পক্ষ হতে এই গ্রামের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধত আছে। যদি আমাদের উন্নতি হয় আমাদের লেখাপড়া হয় আমার বাবা এই গায়ে লেখাপড়া করে যদি ব্যারেস্টার হতে পারে তবে কেন আপনাদের ছেলে মেয়েরা পারবে না? আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলে এবং পথ দেখিয়ে দিলে তবে সব সম্ভব। কীভাবে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম-এর আওতাতে আপনাদের নিলে। সে আমার কি করে এই প্রোগ্রাম বাস্তিবায়িত হবে। এই ধরুন আমি আপনাদেরকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যে যেদিকে আছেন তাদের সেই লাইনে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করবো বিনা লাভে। শুধু আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ থাকবে পুঁজি নষ্ট করবেন না ভেঙে খেয়ে ফেলবেন না। এবার হত দরিদ্রদের বেছে বেছে ত্রিশ জনকে তাদের চাহিদা কী ধরনের কাজ করবেন সে অনুযায়ী অর্থ দেওয়া হবে। আমার দেওয়া অর্থ দুই বছরের মধ্যে লাভের অংশ রেখে ফেরত দিতে হবে আর যদি কোন প্রকার আয় উন্নতি না করতে পারেন তাহলে আমার টাকা যে ভাবে হোক ফেরত দিতে হবে, যদি আমার শর্তে রাজি হন তবে আপনাদের ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য সহযোগিতা করবো। আস্তে আস্তে এবার ত্রিশ জন আগামী বার ষাট জন তারপরের বছর একশত কুড়িজন এভাবে প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে। আর যদি না পারেন তবে সমুদয় স্থবির হয়ে যাবে কথাটা মন রাখবেন কেমন। এখন আপনারা আসতে পারেন। আগামীকাল এসে টাকাগুলি নিয়ে যাবেন। আজি চেয়ারম্যান সাহেবকে দিয়ে কার কি অবস্থা কি করতে চান লিখিত ভাবে আমার কাছে দেবেন। আমি কে কে প্রাপ্য যাচাই বাছাই করব সেই হিসাবে হাতে টাকা তুলে দেবো।

রুহিত আজ রাত্রিতে অনেক কিছু নিয়ে বিরুকে সাথে করে কেয়াদের বাড়ি আসে। প্রথমত বিরু আর ভ্যানওয়ালাকে দিয়ে খাদ্য খাবার পাঠিয়ে দিতেই কেয়া অনুমান করে নিলো যে রুহিত এসেছে। তবে এসব খাদ্য খাবার দেখে কেয়ার বাবা মাস্টার সাহেব কেয়াকে বলে এতসব জিনিস কে পাঠিয়েছে। বাবা তোমাকে বলেছিলাম না ব্যারিস্টার শওকত সাহেবের ছেলে পাশের গ্রামে এসেছেন রাস্তাতে পরিচয়, হয়তো তোমার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য আসবেন। কেয়ার বাবা বলে এতো বড় ঘরের মানুষটিকে বাহিরে রেখে এসেছিস। (কেয়ার বাবা বলে) যা যা ভেতরে নিয়ে আয় ছি ছি কি লজ্জার কথা। বাবার ব্যারিস্টারের ছেলে নাকি আমার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে। কেয়া বাবার সম্মতি পেয়ে দ্রুত রুহিতকে ডেকে বাড়ির ভেতরে ঘরের কক্ষে বসতে দিয়ে কেয়া অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভাবে ছেলেটির সাহস আছে বলতে হবে। বলতে না বলতে একেবারে অন্দর মহলে। এতক্ষণে রুহিত মুখ খুললো নিজের বাড়িতে এসেছি একটু প্রাণ খুলে আরাম আয়েশ করবো তা না শান্তিতে ঘুমাতেই পারছি না। মনে হয় চোখের ঘুম কেউ কেড়ে নিয়েছে।

কেন রে ঘুম কেড়ে নিয়েছিস একেবারে চিরতরে নিজের করে নিলেই তো সেটা চুকে যায়। তাহলে তো আর চোখের ঘুম হারাম হয় না। আমিতো সে কারণেই এলাম। বাবা মাকে খবর দিয়েছি হয়তো দুএকদিনের মধ্যে তিনারা আসবেন এলেই কথা বার্তা সেরে একেবারে বিয়ের পিঁড়িতে। কি শয়তানরে বাবা। না যা হবে বা হবার তা দেরী করে লাভ নেই। কেয়া তুমি এক কাজ করো তোমার বাবাকে ডেকে দাও আমি তাহার সাথে কথা বলতে চাই। কেয়া বলে আজ! ঠিক আছে তুমি বসো আমি বাবাকে ডেকে দিচ্ছি। বিরু বাইরে বারান্দাতে বসে নাস্তা খাচ্ছে। কেয়া খাবার সময় বলে বিরুকে আর কিছু লাগবে? না ভাবী, বিররু মুখে ভাবী ডাক শুনে কেয়া এদিক সেদিক তাকিয়ে তোমার আর কিছু লাগলে বলো আমাকে। বিরুর সাথে ভ্যানওয়ালা এসে খাচ্ছে।

আচ্ছা ভাবী। বিরুর বয়স মাত্র কুড়ি বাইশ। বাবা মার একমাত্র ছেলে বাবা মা এবং বিরু ওরা রুহিতদের বাড়ি দেখভাল করে থাকে বিগত অনেক বছর হয়ে গেছে অর্থাৎ পূর্ব পুরুষ হতেই। রুহিত কেয়ার থাকার ঘরের কক্ষে এসে বসে আছে। কেয়ার বাবা মা এসে ঘরের ভেতরে ঢুকতেই রুহিত দাঁড়িয়ে ছালাম দিলে কেয়ার বাবা রুহিতকে বসতে বলে কেয়ার বাবা মাও বসে। রুহিত কেয়ার বাবা মার উদ্দেশ্যে বলে, আমাকে হয়তো চিনবেন বা ইতোমধ্যে কেয়ার মুখে শুনে থাকলেও শুনেছেন। কেয়ার বাবা বলে, আপনার বাবার সাথে আমার পরিচয় ছিলো স্কুল হতে। ব্যারিস্টার সাহেব ছিলেন আমার তিন বছরের সিনিয়র। যাক সে কথা তাই কি বলবেন বলে এসেছেন আপনি আপনার কথা বলতে পারেন। রুহিত এদিক সেদিক চেয়ে সামান্যতম চিন্তা করে কোন প্রকার ভণিতা না রেখে সরাসরি কেয়ার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলে আমি কেয়াকে বিয়ে করতে চাই। যদি আপনাদের আপত্তি না হয়। কেয়ার বাবা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলে কেয়ার যদি মত থাকে আমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে আপনারা কোথায় আর আমরা কোথায় আকাশ পাতাল ব্যবধান আপত্তি হলে আপনাদের তরফ হতে হতে পারে। আপনার বাবা মা কি আমার মত ছাপোসা সামান্য স্কুল মাস্টারের মেয়েকে আপনার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হবেন। রুহিত বলল, সে চিন্তা আমার। আমার কেয়াকে পছন্দ হয়েছে আশা করি আমার পছন্দের উপর আমার বাবা মার নির্ভরতা আছে বলে মনে হয়। কেয়ার মা বলে তাহলে তো ভালোই। বাবা মাকে খবর দেওয়া হয়েছে বিরুর বাবাকে দিয়ে উনারা এলেই বিয়ের বিষয়াদী সম্পূর্ণ হবে। তবে বিয়ের যাবতীয় খরচ খরচা আপনাদের নয় সব ব্যবস্থার দায়িত্ব আমার এবং বিবাহ অনুষ্ঠান আপনার এখানেও নয় আমার বাড়িতে নয়। বিবাহ সম্পাদন হবে আমার এবং কেয়ার পরিচিত অজ্ঞাত বসবাসে। তবুও তো আমাদের দায়িত্ব রয়ে যায়। কোন দায়িত্ব নয় আমি আর বেশি দেরী করতে চাই না বাবা মা এলেই আবার দেখা হবে। রুহিত কেয়াদের বাড়ি হতে বেরিয়ে আসতেই পেছনে পেছনে কেয়া দৌড়ে এসে, তবে তুমিই জিতে গেলে। আরে না না এখানে হার জিতের প্রশ্ন নয়। একজন রাজরানীকে পেতে গেলে কিছুটা তো সেক্রিফাইজ করতে হয় তাই নয় কি? দেখ রুহিত আমার তোমার মধ্যে দুদিনের পরিচয় এর মধ্যে বিয়ে পর্যন্ত গড়িয়ে নিচ্ছ। কিন্তু কই তুমি তো আমার সম্পর্কে কোনো কিছু জানার চেষ্টা করলে না জানলে না আমি কেমন আমার চরিত্র আমার ব্যবহার আমার পরিবার। দেখো কেয়া আমি বিদেশ করে ফিরেছি, কাজেই বেশি চেনা জানার দরকার নেই যতটুকু চিনেছি জেনেছি এর বেশি জানতে হলে আমাকে ছদ্মবেশের পথে নেমে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে না বাবা আমার এত সময় নেই। কেয়া মৃদু হাসি দিয়ে, ভালো থেকো খোদা হাফেজ। রুহিত কেয়া হতে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে চলে আসে। অন্য দিকে রুহিতের মোটিভেশনাল কর্মসূচির ব্যাপারে নিখুঁতভাবে আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে ত্রিশটি রেখে বাকী দরখাস্ত আলাদা করে যার যার প্রাপ্য অনুযায়ী চেক লিখে রাখলেন। কম বেশি প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকার চেক প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে করে গ্রামের লোক স্বাবলম্বী হতে পারে। রুহিত তার নিজ গ্রামে এসে মহত্বের কাজ করে গেলো। ফলে গ্রামের সকলেই খুশি এবং যারা যারা আবেদন করেছে তাদের সকলকে বলে দিলো, আমি আপনাদের আবেদন রেখে দিলাম কেউ নিরাশ হবেন না। আস্তে আস্তে সকলকেই মোটিভেশনাল কর্মসূচির আওতাতে নেওয়া হবে। আগেই ঢাকা হতে রুহিত চুক্তি নামার ফরম করে এনেছিলো। নাম এবং অর্থ প্রদান অনুসারে প্রত্যেকের টিপসই স্বাক্ষর রেখে দিলো। রুহিতের বাবা মা এলো, ছেলের বৌ করতে কেয়াকে দেখা পর্যন্ত হলো এবং হলো কেয়ার বাবা মার সাথে চেনা জানা পরিচয়। হলো অজ্ঞাত বসবাসে। আলাল সর্দারের বাড়িতে ধুমধাম করে বিয়ে সম্পাদন হলো তারপর কেয়াকে নিয়ে রুহিত ঢাকা বাসাতে আনন্দের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে শুরু করলো। কেয়া যে চাকরি করতো রুহিতের পরিবার অর্থাৎ বাবা মা কোন প্রকার বাধ্য প্রয়োগ করলো না উপরন্তু কেয়ার জন্য শ্বশুর একটি গাড়ি কিনে উপহার দিলেন যাতে করে বৌ-এর অফিসে যাতায়াতের অসুবিধা না হয়। রুহিতের স্ত্রী কেয়া মহা খুশি এবং শ্বশুর শাশুড়ি কেয়াকে পেয়ে মনে হলো তাদের স্বর্গ পেয়েছে। কেয়াও শ্বশুর শাশুড়ির মন যুগিয়ে তাদের সেবা যত্ন করে বিধায় কোন কাজে শাশুড়িকে হাত লাগাতে দেয় না। আর অফিসে যাওয়ার আগে সমস্ত কিছু শেষ

করে তারপর অফিসে চলে যায়। যাবার সময় বলে যায় মা যদি শুনেছি আপনি কোনোকাজে হাত দিয়েছেন তাহলে আমি কিন্তু সোজা বাপের বাড়ি চলে যাবো। লক্ষ্মী বৌ মা আমাকে একেবারে বসিয়ে অলস করে দিও না। অলস হবে না বাবা আপনি ফজরের নামাজ পড়ে সোজা মর্নিং ওয়াকে যাবেন। এই ফাঁকে আপনাদের চা নাস্তা টেবিলে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা তোমার কথাই হবে। অন্যদিকে শ্বশুর চিৎকার করে বলছে বৌমা বৌমা। শাশুড়ির কক্ষ হতে দ্রুত শ্বশুরের কক্ষে এসে বৌমা দেখতো আমার কোট, টাই পাচ্ছি না। বাবা গত রাতে না আপনাকে দেখিয়ে ড্রেস আলমারিতে রাখলাম। কেয়া ড্রেস আলমারি খুলে সাদা শার্ট, কালো বুট প্যান্ট টাই বাহির করে দিলে শ্বশুর ভীষণ খুশি হলেন। বাবা টেবিলে চশমা, মানিব্যাগ, হাংকার ছিপ আছে ভুল করে ফেলে যাবেন না কিন্তু। বৌমা তুমি অফিসে যাবে আজ। জ্বি বাবা আমি তোমার অফিসের রাস্তা দিয়ে যাবো তুমি আমার সাথে যেতে পারো। আচ্ছা বাবা আমি তৈয়ার হয়ে আসছি। আমার গাড়ি রুহিত নিয়ে গেছে। আমি জানি বলেই তোমাকে অফার করলাম। ঠিক আছে তুমি এসো রেডি হয়ে। কেয়া সব কিছু ঠিকঠাক রেখে সব দিক সংসারের কাজ কর্ম সামলিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বে সহিত একজন মানুষ হিসাবে ব্যারিস্টার পরিবারে তুলে ধরেছে। কেয়া এর মধ্যে একদিন সংবাদ পায় বাবার বিষণ অসুখ তাই শ্বশুর শাশুড়িকে বলে অনুমতি নিয়ে শ্বশুরের দেওয়া গাড়ি রুহিত চালিয়ে প্রথম সলপ নিজ গ্রামে তারপর বাবাকে দেখে সারারাত থেকে খানিকটা সুস্থ হলে পরদিবস শ্বশুরের গ্রামের বাড়ি ভিটাতে আসে। সারাদিন সারা রাত থেকে তার পর দিবস অজ্ঞাত বসবাস আলাল সর্দারের বাড়ি দুইদিন থেকে পুনরায় আরও একদিন বাবার সাথে থেকে বাবাকে ডাক্তার ঔষধ পথ্যাদী দিয়ে সুস্থ করে আবার ফিরে এলো ঢাকাতে। কিন্তু কেয়ার এমন অবস্থান দেখে বাবা মা আলাল সলপ ইউনিয়নসহ এবং আশেপাশের দশ গ্রামের লোকজন অবাক। তাই সকলে বলাবলি করছিলো কেয়া মেয়েটি সত্যিকারের ভাগ্য নিয়ে জন্ম নিয়েছিলো। শুধু কেয়া, রুহিত, যাদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করেছে তারা সকলে বিগত পাঁচ/ছয় মাসে অনেক উন্নতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছেছে। আসলে রুহিতের মোটিভেশনাল কর্মসূচি বর্তমান যুগে ভালোই উদ্যোগ, একটু হিসাব করে চললে এবং কাজের মধ্যে থাকলে কেউ লসে পড়বে না। শুধু দরকার হয় টাকা আর সাহস পরিকল্পনা করা মত জ্ঞান বুদ্ধি সর্বশেষ রুহিত দুহাতে আলালের বাড়ি অজ্ঞাত বসবাস নিজের গাঁয়ের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি প্রচুর পরিমাণ খয়খরচা বা মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলে গেলো।

নিঃসঙ্গ জীবনের পরিত্রাণ

আমি মাস্টার্স পাস করে ভালো চাকরি করা সত্ত্বেও এই ৩০/৩৫ বৎসর বিয়ে না করে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করায় বাড়ির লোকজন, আত্মীয় স্বজন পারিপার্শ্বিক বন্ধু বান্ধবীদের যেন ঘুম হারাম হয়ে গেছে। তার সাথে সাথে তাদের কথা ভেবে তাতে আমারও অবস্থা তাই এসে দাঁড়িয়েছে। সকলে বলাবলি করছে একটি মেয়ে মানুষ এতো বয়স হয়েছে বিয়ে সাদী এখনও করছে না নিশ্চয়ই মেয়েটির কোন শারীরিক দোষ আছে তা না হলে বিয়ের পিঁড়িতে বসছে না তার কারণ কি। এভাবে পক্ষে বিপক্ষে আলাপ সমালোচনা শুনতে একেবারে অতিষ্ট হয়ে গেছি। এর আগে আমাকে নিয়ে অফিস আদালতে কোন কথা ছিলো না এখন দেখি সেখানেও আস্তে আস্তে সুর গেলো টুংটাং শব্দ কানে আসতে শুরু হয়েছে। তবে এখন যাবো কোথায় আমার কি করা উচিত বিয়ে না যেমনি আছে তেমনি নিসঙ্গ জীবন কাটিয়ে দেওয়া। যাই হোক একদিন এক সুদর্শন যুবক আমাদের বাসাতে এসে হাজির। কথা বার্তাতে মনে হলো মামা বাড়ির কেউ হবে হয়তো। আমি আগে দেখেছি কি দেখিনি বলে মনেও পড়ে না কারণ ছোট বেলা হতে কারোর সাথে খুব একটা মিশেছি বলে মনে হয় না। তবে একজনের সাথে মিশতাম কিন্তু সে কি আছে কি নেই জানি না। তাই মনে হয় না। আগেও যেমন ছিলাম এখনও একই ভাবে সময় অতিবাহিত করে কাটিয়ে দিচ্ছি। আগে মা বাবা আমার একাকী নিয়ে মাঝে মধ্যে কথা বলতেন, কিন্তু বলে বলে ফেডাব তাই এখন আর আমাকে নিয়ে তিনারা মাথা ঘামায় না। সুদর্শন যুবককে এক নজরে দেখে মন হয় সেও আমার মত বয়স পার করে চলছে। তবে বিয়ে করেছে কি করে নাই এখনও আমার জানা নেই। তাছাড়া যুবকটি বিয়ে করলো কি করলো না তা নিয়ে আমার তো মাথা ব্যথা হওয়া উচিত না। আজকে অফিস ছুটি বলে আমার বিশেষ বান্ধবী তাসমিনার বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ড্রইংরুমের উপর দিয়ে বাইরে পা রাখতে বাবা মা উভয়ে ডাক দিয়ে বলে মিতা শোন এদিকে আয়। দেখতো ওকে চিনতে পারিস কি না। মনেমনে বললাম চিনি তো পরে বললাম কি করে চিনবো উনাকে আমার বাবার জন্মে দেখেছি কি না মনে পড়ে না। আমি সরাসরি বললাম না আমি উনাকে চিন্তে পারছি না। আমি যখন ড্রইং রুমের উপর দিয়ে বাহিরে যাচ্ছি তার আগে বাবা মার সাথে যুবকটির কিনা কি নিয়ে হাসি ঠাট্টা তামাশার আলাপচারিতা হচ্ছিলো।

বুঝেছিলাম মা কিংবা বাবার কেউ নিকটতম আত্মীয় স্বজনের ভিতরে হবে হয়তো তা না হলে এতো ক্লোজভাবে বসে কথা বলতে পারে কীভাবে। বাবা বললো কেনরে মিতা আহসান হাবিবকে চিনিস নাই? তোর মনে পড়ে না সেই ছোট বেলায় তোর দুটি মার্বেল চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল বলে তা নিয়ে যা ইচ্ছা না তাই ব্যবহার করে ওকে অপমান করেছিলি। সেই পর হতে আর আমাদের গায়ের বাড়ি বানাইলে আসেনি। তুই সত্যি কি ওকে চিনতে পারিসনি! আহসান হাবিব হলো তোর মার চাচাতো ভাইয়ের ছেলে তুই যাকে লালু মামা বলে ডাকতিস। মিতা বাবা আতোয়ার আলী খানের কথার উত্তরে, বলল তা আমার কি করতে হবে। মিতার মা মেরিনা খান মিতার কণ্ঠে বিরক্তের সুরের আভাস পেয়ে বলে আহসান হাবিব বিদেশ হতে লেখা পড়া করে সরকারি একটি উচ্চপদস্থ পদে চাকরিতে জয়েন করেছে। সেইতো বুঝলাম উনি উচ্চ পদস্থ নাকি নিম্নপদস্থ পদে চাকরি পেয়েছে তাতে আমার লাভ কী। এতক্ষণে আহসান হাবিব বুঝতে পারে রীতিমত মিতা আমাকে দেখে একদিকে খুশি নয় অন্যদিকে এক্সাইটেড মাইন্ডে থেকে গ্রহণ করতে পারছে না। সেই জন্য বলে ফুফি ওর মনে হয় এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গ ভালো লাগছে না। মিতা তুমি হয়তো কোথাও যাওয়ার জন্য বেরিয়েছো, আচ্ছা তুমি যেতে পারো, আমি কিছুই মনে করবো না। আবার কখনো তোমার আমার আমাদের দেখা হয় তখন না হয় সব স্মৃতি নিয়ে কথা হবে। আহসান হাবিব, বাবা ও মা হঠাৎ মিতার এহেন আচরণে ভীষণভাবে আহত বা দুঃখ পেলেন। মিতা কোন প্রকার সৌজন্যবোধ না দেখিয়ে কোন রকম কথা না বলে সোফা হতে উঠে বাইরের দিকে দরজা খুলে হনহন করে চলে গেলে আতোয়ার বলে, বাবা আহসান তুমি মিতার এহেন ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়ো না ও বরাবর জেদি তুমি তো তা ছোট বেলাতেই দেখেছো। কিন্তু ওর মনটা পরিষ্কার কোন প্রকার অহংকার নেই। বাদ দেন এসব নিয়ে আর কোন কথা বলার প্রয়োজন আছে মনে হয় না। ফুফু মেরিনা খান আহসানকে দুপুর পর্যন্ত থেকে খেয়ে যাওয়ার জন্য জানালে আহসান বলে আজ নয় অন্য যে কোন বন্ধের দিন এসে সারা দিন থেকে আড্ডা দিয়ে যাবো তাছাড়া আমার মায়ের কথা রক্ষার্থে তো আসতেই হবে। ফুফা অর্থাৎ আতোয়ার সাহেব বলে তোমার মা কি এমন শর্ত দিয়ে দিয়েছেন যে মার কথা রক্ষা করতে আসতে হবে। আহসান আতোয়ার ফুফাকে বলে সে অনেক অনেক কথা যা আরেক দিন এসে আমার পেটের জমানো কথা বার্তা উগড়ে দিয়ে যাবো। এই বলে সোফা হতে উঠে দাঁড়িয়ে ফুফু ফুফা হতে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পথে পা বাড়ালো। বাসার বাইরে এসে বাসার চারদিক ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করতে আকাশের দিকে তাকাতেই সূর্যের রশ্মি চোখের মধ্যে পড়লে মুহূর্তেই চোখ দিয়ে আর কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। অন্ধ অন্ধ লাগছিলো তাই একটু দাঁড়ালাম নিমিষে ঘোর কেটে গেলে একটি রিকসা ডেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আজ দশ/এগারোটার সময় এতো তীব্র গরম যে পিচঢালা পথ গলতে শুরু করেছে বিধায় রিকসা টানতে রিকসাওয়ালার কষ্ট হচ্ছে। রিকসাওয়ালা আহসানকে বলে স্যার আজ যে কি গরম আপনার মাথাতে তো সূর্যের তাপ লাগছে মাথার হুড়টা টেনে দেই। থাক দরকার নেই মাঝে মধ্যে দুধারে একটু একটু ফাঁকা ফাঁকা করে বড় গাছে ছায়া পড়ছে আর মৃদু বাতাস আছে বলেই রক্ষা। আহসান হাবিব বেইলি রোডে একটি সরকারি বাসার ফ্ল্যাট পেয়েছে খুব সুন্দর ছিমছাম এক দিক বেলকুনি তিনটা বেড রুম প্রত্যেকটি বেড রুমের সাথে বাথরুম রয়েছে। আহসান হাবিবের ইচ্ছা বিয়ে করে বৌ এনে গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকা একাকী মাকে এনে রাখবো। আল্লাহ জানে আমার ইচ্ছা আদৌ পূরণ হয় কি না। বাসার গেট দিয়ে প্রবেশ করে বাসার সামনে রিকসা এসে থামলে আহসান রিকসা হতে নেমে ভাড়া মিটিয়ে বাসার ভিতরের কক্ষে চলে যায়।

মিতার অফিস বন্ধ থাকায় বান্ধবী তাসমিনার বাসাতে আসে। তা অনেক দিন পর। তাসমিনা ইতোপূর্বে হাসব্যান্ডসহ কানাডাতে ছিলো এখন বাংলাদেশে চলে এসে দুইটি ছেলে নিয়ে বসবাস করছে স্বামী ছাড়া। স্বামীর সাথে মনোমালিন্যর কারণে ধরতে গেলে কানাডা হতে ঢাকাতে থাকা। অবশ্য ছেলের দুজনের খরচ তাসমিনার খরচ তাসমিনার স্বামী রেজাউল দিয়ে থাকে এখনো ডিভোর্স বা ছাড়াছাড়ি হয় নাই বা কেউ কাউকে বিয়েও করে নাই। আসলে ওদের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ দুজন দুজনকে অতিরিক্ত সন্দেহ করে। তাসমিনা স্বামী যে খরচ খরচা দিয়ে আসছে তাতে ওদের তিনজনের ভালোভাবে হয়েও অবশিষ্ট আরও বেশ অর্থ থেকে যায়। বাংলাদেশে তাসমিনা এসে এখন বুঝতে পারছে স্বামী ছাড়া একাকী ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকা নিঃসঙ্গ জীবনের সামিল। তাছাড়া মোটেই নিরাপদ নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে ভাইবোন তাসমিনার শ্বশুর বাড়ির লোকজন এসে খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছে। তাতে কি স্বামীর অভাব দূর হয়। আসলে স্বামী স্বামীই হয়। স্বামী যতই খারাপ হোক একজন বিবাহিত মেয়ে মানুষের কাছে কত গার্ডিয়ান কত বড় নির্ভরতার জায়গা তা যদি আমাদের মত রাগি মহিলারা আগে ভাগে বুঝার চেষ্টা করতাম তবে আমার মত কষ্টের নিঃসঙ্গ জীবনে পরে কুরে কুরে খেতো না। এইসব চিন্তা ভাবনার মধ্যে মিতা এসে তাসমিনার বাসার কলিংবেল চাপ দিলে তাসমিনা দরজা খুলতে দুই বান্ধবীর অনেক দিন দেখা না হওয়ার কারণে

গলায় গলায় দুজন দুজনে জড়িয়ে ধরে মিতা বলে তোর সাথে কত দিন পর দেখা হলো তা তুই কেমন আছিস। ভালো মন্দ দুটোই মিললো। আয় আয় ভিতরে আয় অনেক কথা আছে তোর সাথে। তুই এসে ভালোই করেছিস সেই কলেজের পরে দেখা হলো আজ। তাসমিনা মিতাকে এক প্রকার হাত টেনে নিয়ে বলে, বস। তা বসছি আচ্ছা তোর ছেলেরা কোথায় স্কুলে ফিরতে ফিরতে সেই বিকাল হবে হয়তো। তাহলে তুই ছেলে সন্তান স্বামী নিয়ে সুখেই আছিস। মিতা শোন সুখের ডেফিনেশন কি আমি জানি না তবে নিজের সুখ নিজের হাতে বলতে পারিস বিসর্জন দিয়েছি। তা তুই বল কেমন আছিস তোমার স্বামী বাচ্চা-কাচ্চাদের তো দেখছি না। কি যে বলিস বিয়ে হয়নি তার আবার বাচ্চা-কাচ্চা। নিঃসঙ্গ একাকী জীবন নিয়ে পথ চলছি। কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না। বিয়ের জন্য বাড়ি হতে বাবা মা আত্মীয় স্বজন চাপ সৃষ্টি করছে। এই যে আজ আমার মনে হয় আজও মার চাচাতো ভাইয়ের ছেলেকে দেখলাম। যে নাকি আমার ছোট বেলার মার্বেল খেলার সঙ্গী দেখে মনে হলো হয়তো বাবা মার কাছে আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব রেখে গেছেন। তবে বলতে হবে ছেলেটা অনেক হ্যান্ডসাম বিদেশ হতে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসে বাংলাদেশে সরকারি কোন জব করছে। তাসমিনা তোর পছন্দ হয়নি? হয়নি মানে ছেলেটিকে দেখে যে কেউ এক বাক্যে চোখ বন্ধ করে লুফে নেবে। বললাম কি তবে তো আমি ভুল করেছি। শুধু ভুলই নয় বাবা মার পছন্দের ছেলে ছিলো আমার স্বামী ডক্টরেট করা। দেখে মনে করবি কোন ক্ষেত হতে উঠে এসেছে। এ নিয়ে তো আট বছর যাবত মনের দণ্ডে মনোকষ্টে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কেন আমি না জানতাম তোর একটা পছন্দের ছেলে ছিলো তাকেই না বিয়ে করার কথা। হয় নাই মা বাবার কারণে। সে যাকগে অনেক দিন পরে দেখা বল কি খেতে চাস, প্রথমত এই জিজ্ঞেস দ্বিতীয়ত সারাদিন থাকবি আমার বাসায় দুই বান্ধবী মিলে গল্প গুজব করবো খাওয়া দাওয়া হবে তারপর তোর ছুটি। তাছাড়া আমার দুষ্টু দুটি ছেলে রাজন আর সজনকে দেখবি, দেখলে মনে হবে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে পারে না। দুষ্টের সেরা মনি দুইটিই হয়েছে। বাদর। মিতা ছেলেদের বিবরণ শুনে হেসে উঠে, ভাগ্যিস আমার বিয়ে হয়নি তাছাড়া সন্তানাদী হয়নি। একা আছি বেশ আছি এভাবেই নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করে দেবো। মিতা তোকে একটা কথা বলি যা আগে নিজের ভেতর উপলব্ধি করতে পারিনি। আসলে ছেলে মেয়ের এই দুষ্টামী হইহুল্লোড় মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া ঝাটির মধ্যে দিয়ে দিন শেষে আনন্দ আছে তা হলো মান অভিমান ভেঙে আবার দুজনে এক সাথে মিলেমিশে সময়কে পার করে নেওয়া। দেখ না আমাকে এখানে রেজাউল সব দিয়ে পরিপূর্ণ করে রেখেছে কালো হোক আমার সাথে বেমানান হোক তবুও বুকের ভেতর শূন্যতা হাহাকার প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করছি, তাই ভাবছি রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে আবার রেজাউলের কাছে কানাডাতে ফিরে যাবো। তাসমিনার কথা শুনে কতক্ষণ নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলো মিতা। পরক্ষণে আবার মিতা তাসমিনাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোকে একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করিস। হেজিটেশন কিরে মিতা তুই না আমার চলার সাথী তুই আমাকে বলে কয়ে জিজ্ঞাসা করে তারপর বলতে হবে। তবে আমি বুঝতে পেরেছি। রুহান বড় লোকের বখে যাওয়া বখাটে একজন ছেলে। ও আসলে আমাকে ভালোবাসতো না শুধু ভালোবাসার অভিনয় করেছে। যখন আমাদের পরীক্ষা শেষ হলো তখন আমি নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে রুহান এখন তো ভার্সিটির পাট চুকে গেছে চল না আমরা বিয়ে করে সংসার পাতি। তার উপরে রুহান বলে এতো ব্যস্ত কীসের আর একটু অপেক্ষা করো বাবার ব্যবস্যা বাণিজ্য হাতে নিয়ে নেই। তার কথার উত্তরে আমি বললাম, বাবা মার সম্পত্তি ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে কি হবে তুমিও শিক্ষিত আমি শিক্ষিত সেই সূত্রে কোন না কোন ভালো একটা চাকরি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু রুহান আপত্তি করলো বললো আমাকে দেখো তাসমিনা আমার বাবার আন্ডারে শত শত লোকজন চাকরি করে চলেছে আর আমি তারই ছেলে হয়ে চাকরি করবো তুমি ভাবলে কি করে আর তোমাকে বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে আমার পরিবার এলাও করবে তা কখনও হবে না হতে দেবে না। তাহলে এতো দূর পড়াশোনা ভার্সিটি পার করে কি লাভ। লাভ একটাই তুমি বড় একজন কোটিপতির ছেলেকে নিজের আপন করে পাচ্ছো। এতোদিন পর্যন্ত তো ভালোবাসা বাসি প্রেম দেখা না দেখার মধ্যেই চলছি। এখন শুধু ইনজয় আর ইনজয় তোমার আমার বিয়ের আগে একান্তভাবে চাওয়া পাওয়া পূরণ করার শেষ চাওয়া শেষ খেলাধূলা। এই তাসমিনা চল না কক্সবাজার সৈকতে দুজনে বেরিয়ে আসি। রুহানের কথার মধ্যে হারাবার গন্ধ খুঁজে পেলাম, পেলাম না বিশ্বাস নির্ভরতার স্পর্শ। রুহানের সাথে রুহানের কথা বার্তার মধ্যে আমার চরিত্র ধুলায় লুণ্ঠিত হবে ভেবে ওর দিকে ওর ফাঁদে আর পা দিলাম না।

এই ফাঁকে রুহানের সাথে বেশ কিছুদিন দেখা নেই। পরে জানতে পেলাম আমার আগে পরে অনেক মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে অর্থ কড়ি দিয়ে সহযোগিতা করার নামে ছোবল মেরেছে। তাদের ভোগ করে জীবন নষ্ট করে দিয়েছিলো। শুধু তাই নয় শুনেছিলাম কলেজে পড়াশোনার মধ্যে দিয়ে একজন মেয়েকে ভালোবাসার রঙ্গমঞ্চে নিয়ে তার সর্বনাশ করে ধরা পড়ার কারণে অবশেষে কয়েক দিন বিয়ে করে রেখে ছেড়ে দিয়েছিলো। এই কথা

জমিলা আমাকে পরে জানলে আমি বললাম তুই আমার বান্ধবী হয়ে এতটা জেনেও বলিসনি। কি আর করবো উচ্চ ডিগ্রি নেওয়ার জন্য বাবা মাকে বলে কানাডাতে চলে গেলাম। ওখানে আমার সম্পর্কে আত্মীয় এর মধ্যে আমার এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে বাবা মাকে কানাডাতে নিয়ে রেজাউল-এর সহিত বিয়ের ব্যবস্থা করে। যদিও কিছু দিন আমার ঘোর আপত্তি ছিলো তবুও এখন বুঝি রেজাউলের হতে রাগের মাথায় সরে এসে ভুল হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি আমার স্বামীর কাছে চলে যাবো ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি রেজাউল ও বলেছে আর ৪/৫ মাস থাকতে থাক আমি এসে সবার সাথে দেখা সাক্ষাত করে তোমাদেরকে নিয়ে আসবো। মিতা বলে ভালই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস। তাসমিনা মিতাকে বলে একাকী সঙ্গীবিহীন নিঃসঙ্গ জীবন ভালো না একজন পুরুষ মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যও প্রয়োজন হয়। যেমন আমাদের পূর্ব পুরুষ চলে এসেছে আমাদেরও ধারাবাহিকতার জন্য চলে যেতে হবে, আবার আগামী প্রজন্মও আমাদের দেখে চলবে এভাবে বংশ ক্রমান্বয়ে আজীবন চলতে থাকবে যদি না পৃথিবী আল্লাহর নির্দেশে বন্ধ না হয়। এতদিন আসলে এভাবে ভাবিনি। তোর কথা শুনে মনে হলো আমারও তোর মত সংসার করার প্রয়োজন। দেখি মা বাবাদের মত প্রকাশ করে। ঠিক আছে সারাদিন অনেক কথা হলো যাবর আগে তোর স্বামী দেশে এলে আমাকে জানাস আবার দেখা হবে। তাছাড়া আমার বিয়ে হলে তো বিয়ের দাওয়াতে অবশ্য থাকতেই হবে। দুজনে দুজনার হতে বিদায় নিয়ে মিতা মুখ মলিন করে গৃহে ফিরলো। মা লক্ষ্য করে কাছে এসে বলে কিরে মা তোর মুখখানা আঁধারে ঢাকা পড়ে আছে কি হয়েছে আমায় কি বলা যায় না। বাবা কোথায় গো তোর বাবা বাইরে আছে কেন কিছু বলতে হবে। না শুধু বাবাকে রাতের খাবারের সময় যেন আমাকে ডেকে খাবার টেবিলে বসেন। আমি যাই ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। মনে হয় মাথা ফেটে যাবে। কেন হঠাৎ এমন হলো বোধ হয় আজ বেশি চিন্তা করেছি। তাছাড়া আহসান হাবিবের সাথে কটাক্ষ সুরে কথা বলায় হয়তো এখন মনে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিস। তা নয়। তা নয় কি আমি চিনি না আমার মেয়েকে, সে যে কাউকে কষ্ট দিলে যে তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায়। আচ্ছা তুই তোর কক্ষে যা আমি কিছুক্ষণ পরে এসে মাথা টিপে দিয়ে আসবো ক্ষণ।

রাত্রি নয়টা যথারীতি খাবার টেবিলে খাবার দেওয়া হলো সেই সাথে মিতাকে ডাকলো। মিতা বাবার কাছে এসে বসে খেতে খেতে বলল, বাবা আমি বিয়ে করতে চাই।

হঠাৎ আমার মেয়ের সুমতি হওয়ার কারণ সূর্য কোন দিক হতে উঠেছে দেখতো মেরিনা। বাবা রসিকতা করো না তো। বাবা বলে রিয়ালি টুট সত্যি তুমি বিয়ে করবে সেতো ভালো কথা, তা তোমার পছন্দের কেউ আছে না আমাদের ঠিক করে দিতে হবে। কেন যে ভণিতা করো বাবা তোমাদের তো ঠিক করা ছেলে রেডিই আছে। মা বলে তুই কার কথা বলছিস ও বুঝেছি তুই আমাদের আহসান হাবিবের কথা বলছিস। বেশ আগামী কালকে ওকে ডেকে জেনে নিই। আহসান হাবিব তার বিয়ে করার ব্যাপারে কি বলে। মিতা বলে, না আগামীকাল নয় আমি তোমাদের সিগনাল দিলে তারপর আমার সাথে আহসান হাবিবের সহিত বিয়ে প্রস্তাব রাখবে। তার আগে আমি আহসানের সাথে দেখা কথাবার্তা সেরে নিতে চাই। বাবা মা সম্মত প্রকাশ করে বলে তা বেশ তো দেখ কথা বার্তা বলে। বিয়ের আগে যদি কথা আদান প্রদান হয় তবে ভালই হবে। বাবা এই কথা বলে খাওয়া শেষ করে টেবিল ছেড়ে নিজ কক্ষে প্রবেশ করে। মা আর মেয়ে আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আজ যে বান্ধবী তাসমিনার বাসাতে গিয়েছিলো তার জীবন সম্পর্কে মার সাথে শেয়ার করে নেই। মা আমি তো তাসমিনার হিস্টোরি শুনে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে রাজি হয়েছি। আচ্ছা উঠি কাল আবার অফিসে যেতে হবে আহসানের সাথে দেখা করতে হবে তা মেলা কাজ। মা মেরিনা মেয়ের কথা শুনে হাসতে থাকে।

মিতা নিজের অফিস আদালত সেরে বসের হতে অর্ধবেলার জন্য ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এলো। মিতার অফিস হতে আহসান হাবিবের অফিসের দূরত্ব মাত্র পায়ে হাঁটা দুই আড়াইশত হাত হবে। হয়তো মিতা হাঁটা পায়েই আহসানের অফিসে গেটে এসে গেটের অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর আহসানের চেম্বারের কাছে এসে আহসানের পিএ'র কাছে জিজ্ঞেস করে আহসান হাবিব সাহেব চেম্বারে আছেন? পিএ বলে, জ্বি ম্যাম উনি একটা জরুরী মিটিং নিয়ে ব্যস্ত, আপনি বসুন আমি এন্টারকমের মাধ্যমে পার্মিশন নিয়ে নেই। আহসানের এন্টারকমের ডায়াল রিং বেজে উঠলো পিএ এপ্রান্ত হতে বলে যে স্যার আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য একজন ম্যাডাম বসে আছেন। ম্যাডাম -এর নাম বলেন, মিতা। আচ্ছা ঠিক আছে মিটিং শেষ হতে আর একটু বাকী আছে তার পর ডেকে নিচ্ছি। তুমি ম্যাডামকে চা নাস্তা দাও। বলে রিসিভারটি ছেড়ে দিলে পিএ রিসিভার রাখতে রাখতে বলে, ম্যাডাম দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন স্যার আপনাকে ডেকে নেবেন। বরং আমি চা নাস্তার ব্যবস্থা করি। না না তার আর দরকার হবে না আমি ব্যস্ত আছি আপনি আপনার কাজ করতে পারেন। ধন্যবাদ বলে মিতা এদিক সেদিক তাকিয়ে দেয়ালে সুন্দর সুন্দর পেইন্টিংগুলি এক এক করে দেখেছিলো। আসলে বলতে

হয় আহসান হাবিবের রুচি আছে। প্রত্যেকটা ছবি মনে হয় জীবন্ত যে পেইন্টিংগুলি করেছে তার সাংঘাতিক ধারণা ভালো। ভেতরে আহসান হাবিবের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্রিফিং দিচ্ছে যে অতীতে আপনারা কে কি করেছেন আমি তার কোন খোঁজ খবর নেবো না। আমি বর্তমান এবং আগামী নতুন দিনে বিশ্বাসী। কাজেই কান খুলে জেনে রাখুন আপনারা এবং আপনাদের ব্রাঞ্চ অফিস যদি কোন অর্থ ঘুষ দুর্নীতির অনৈতিক কাজের সঙ্গে অফিসের দায়বদ্ধ খুন্ন বা কোন লেনদেনের মাধ্যমে তথ্য পাচার করেন তবে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না। এবং জেনে রাখুন আমি কোন ঘুষ দুর্নীতি করবো না আপনাদেরও করতে দেওয়া হবে না এই আমার ফার্স্ট টু লাস্ট কথা। আর হ্যাঁ আমার কথা অপমান হিসাবে নিয়ে গায়ে মাখবেন না কেমন। যা বললাম আপনাদের ভালোর জন্য যাতে করে জনগণের হাতে অন্যায়ের জন্য শাস্তি সাব্যস্ত অপমানিত না হন। আপনারা এখন আসতে পারেন। আহসানের কথা শেষ হলে কর্মকর্তা, কর্মচারী কক্ষের থেকে বেরিয়ে এলে মিতা অনুমতি ছাড়া ভিতরে প্রবশ করে বলে, দেখুন মার্বেল চোর আমি এসেছি আপনার সাথে কিছু কথা বলতে আপনার কি সময় হবে। না হবার কিছুই নেই তবে আপনার কথার উত্তরে বলছি আমরা এমনিতে ঘুষ খোর দুর্নীতির ডিপার্টমেন্টের চাকরিতে জয়েন্টে করেছি। তার উপর যদি শুনে যে ছোট বেলাতে মার্বেল চুরি করে গোপনে চলে গেছি তাহলে পাবলিকের মার একটিও মাটিতে পরবে না সব আমার গায়ে পরে কাক শিয়ালের মত টেনে ছিড়ে ছিন্ন ভিন্ন করে গিলে খাবে। তাও ভালো আপনার কথা পাবলিকগণ শোনেনি। মিতা বিরক্ত হয়ে– আর মন্তব্য বা উপমা দিতে হবে না এখন চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার সাথে আমার পছন্দের জায়গাতে চলুন আপনার সাথে কথা আছে। ব্যাপার কি একেবারে কিডন্যাপ বাইরে নিয়ে তো আবার মার্বেল চুরির দায়ে গণধোলাই দেবেন না। মিতা দেখুন বেশি কথা বললে কিন্তু আমি চলে যাবো। যেতে উদ্ধত হলে আহসান হাবিব মিতার হাত ধরে কাছে টেনে নেয়। মিতা একটু অবাক দৃষ্টিতে আহসানের দিকে তাকিয়ে আহসান বুঝতে পেরে হাত ছেড়ে দিয়ে বলে চলুন। আহসান হাবিবকে নিয়ে মিতা সুন্দর মনোরম পরিবেশের একটি ফুলের বাগানে প্রবেশ করে। বাগানে প্রবেশ করতেই চারপ্রান্ত হতে ফুলের গন্ধ বেশ এটি অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম ফুলের পরশ ছোঁয়ার মত। আসলে আমরা ভুল করলেও প্রকৃতি ভুল করে না তিনি তার রঙে বর্ণে বৈচিত্র্যময় করে সাজিয়ে আমাদেরকে নানাভাবে উপহার দিয়ে থাকেন। মিতা আর আহসান হাবিব এসে একটি স্টিলের বেঞ্চে বসে উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ আপনি হতে নামিয়ে তুমিতে সম্বোধন করলে মিতা বলে তা কেমন আছো আহসান? তুমি ভেবেছো আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। দিব্যি চিনেছি কারণ এখনো তোমার কপালের দাগটা মিশেনি। তোমার মনে পড়েনি আয়নার কাছ গিয়ে আমার কথা মনে পড়ে নি? একজন দস্যি মেয়ের মার্বেলের ঢিলের আঘাতে কপাল খুদে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিলো তখন আমি তোমার রক্ত দেখে কিনা চিৎকার তুমি তোমার রক্তপাত দেখবে কি , তা না তবে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে তোমার কপালে আমার জামা ছিঁড়ে বেধে দিয়ে ছিলাম। শামিম ভাই এসে তুমুল কাণ্ডকারখানা বাজিয়ে বাড়ি শুদ্ধ মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তারপর আমার জ্বর এলে তুমি অসহায়ের মত সারারাত আমার মার কাছে বসে রইলে তোমার বাবা মা তোমাকে মারবে কি ধরবে সে এক এলাহী কাণ্ড। আহসান কথা শেষ করতে না করতে মিতা আহসানের কপালে হাত রেখে সেদিনকার মার্বেল ছোড়ার দাগ বসা দেখে আজও চোখের পানিতে অকাতরে প্রতিটি চোখের পাপড়ি ভিজে গেলো। আহসান মিতার চোখের অশ্রু দেখে সঙ্গে সঙ্গে পকেট হতে হ্যান্ডকারচিপ বাহির করে চোখ মুছে দিতে দিতে বলে, আমি দেখছি সত্যি তুমি এখনও মন হতে ভালোবাসো। মিতা আহসান হাবিবের হতে জানতে চা যে তুমি আমাকে না বলে না কয়ে কেন বিদেশ চলে গেলে, সেদিনের সেই সামান্য অপরাধের জন্য এই সুদীর্ঘ কাল আমাকে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। তুমি করেছো মিতা আমি করিনি আমার বিদেশে প্রতি মুহূর্ত কি করে কেমন করে সময় গেছে তা একমাত্র উপরাল্লাহ জানেন। আমি মনে মনে ভেবেছি তোমার যদি বিয়ে হয়ে যায় তবে আমার কি হবে। কারণ সেই দিন খেলার ছলে তোমার চাচাতো ভাই আরিফ বলেছিলাম আমি তোমাকে বিয়ে করবো। আরিফ এসে তোমার বাবা মাকে এবং আমার মামা মামিকে বলে দিয়েছে। সে হতে আমি বাড়ি ছাড়া ঘর ছাড়া তারপর ঢাকাতে এসে দুঃসম্পর্কের এক আত্মীয় বাড়ি উঠি সেখান হতে দিনের পর দিন স্ট্রগোল করে আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। আমি এতো ফিরিস্তি শুনতে চাই না এখন কি করবে আমাকে বিযে করবে না অন্য কাউকে মন দিয়েছো। আহসান বলল হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি তো । কি বল! এই বলে মিতা দাঁড়িয়ে পড়লে আহসান হাত ধরে টেনে পুনরায় কাছে বসিয়ে বলে, দেখ যদি এতোদিন কাউকে মন দিয়ে দিতাম তাহলে আমাকে একা দেখতে পারতে না সাথে একজন মহিলাকেও দেখতে পারতে। তা যখন হয় নাই তাহলে আর কি করা অগত্যা মধুসুদন তোমাকেই গলায় ঝুলিয়ে নেবো। মিতা হেসে উঠে বলে, মার্বেল চুরি করে ক্ষান্ত হয় নাই সাথে সাথে মনও চুরি করে বিদেশমুখি হয়েছিলে। দেখাবো মজা আগে বিয়েটা হয়ে যাক। আচ্ছা

চল আমার বাসাতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপর তোমার বাসাতে ফিরে এসো। এই ফাঁকে বাবা মার সাথে কথা বার্তা ফাইনাল করা যাবে। হ্যাঁ তাই চল। আমাদের বিয়ের আগে তোমার মাকে নিয়ে এসো যাতে তোমার ঘরে উঠার আগে উনার হতে দোয়া পেতে পারি।

মিতার সাথে আহসান মিতার বাসাতে এলো খাওয়া দাওয়া হলো। মিতার বাবা মার সাথে বিয়ের তারিখ নির্ধারিত আহসানের মাকেও দেশের বাড়ি হতে সরকারি বাসা বাড়িতে এনে তুললেন। কথা হলো মিতার বাবার মার সাথে যে বিয়েটা হবে সম্পূর্ণ ঘরোয়া ভাবে বেশি কিছু আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই। এই মেয়েকে বাসা হতে বিয়ে পড়িয়ে তুলে নাও সময় আমার দুচারজন বন্ধু বান্ধব এবং আমাদের দু'চারজনসহ মিতা বন্ধু বান্ধবী একজন হলে হবে সর্বমোট ২০/২২ জন। মিতা বলে আমারও এখন ৩৫ বৎসর পার হতে চলেছে এখন আর ঢাকঢোল পিটিয়ে বড়সর অনুষ্ঠান করে বিয়ের পিঁড়িতে বসার শখ নেই। তাই আহসান হাবিবের সহিত একমত। মিতার বাবা মা বলে বেশ তাই হবে। তোমরা যেভাবে খুশি থাকো তোমাদের খুশি হলো আমাদের সুখ। মিতা আহসান-এর বিয়েতে সত্যি সত্যি ২০/২২ জন দাওয়াত মেহমান উপস্থিত হলো তন্মধ্যে মিতাকে উপদেশ দেওয়া সেই বান্ধবী তাসমিনাসহ চারজন। বাকী আহসানের অফিস কলিগ এবং মিতার অফিস কলিগ এই আর কি। সুন্দরভাবে বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলো মিতা গৃহ হতে বিদায় নিয়ে স্বামীর সরকারি বাসাতে উঠে প্রথমত শাশুড়ি মার দোয়া গ্রহণ করলো। এরপরে যা হবার হয়ে গেলো। মূলত আহসান এতোদিন পরে আমার জীবনে আসাতে উভয়ের অবশেষে নিঃসঙ্গ জীবন হতে মুক্তি মিললো বিয়ের মাধ্যমে। এখন আর বাধা নেই কোন বেরিকেড নেই শুধু আগামীদিনের সুন্দর সংসারের প্রত্যাশায়। বিহঙ্গ পাখির মত স্বাধীনতার চেতনা উড়ে ঘুরে পথচলা। কেউ যেন কাউকে জীবন হতে হারিয়ে আবার যেন একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের আঁচ না লাগে।

মা আমার পৃথিবী

মা এমনি একটা নাম, এমনি একটা শব্দ, যে ছোট অক্ষরের হলেও মুখ বুক অন্তর হৃদয় ভরে উঠে। কারও মা কিন্তু সন্তানের জন্য কম নয় সবার মা প্রায় সমান। তবে ব্যক্তিত্বের হাবভাবে চলাফেরার বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করার ভিন্নতা রয়েছে। আমি এখন এমন একজন মায়ের কথা বলবো বা লিখছি। তিনি শুধু মমতাময়ী মা-ই নয় তিনি সাংসারিক জীবনে এক সফল দিকনির্দেশক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশিত প্রাপ্তির মা। যেমন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মায়ের ডাকে সাগর পাড়ি দিয়েছিল তেমনি একজন মমতাময়ী মায়ের আঁচলে চারটি ছেলে এবং দুইটি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলো যে তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেক স্থান হতে জুয়েল। তাই গাঁয়ের সকলে বলতেন রত্নগর্ভা। প্রত্যন্তর অঞ্চলে বাড়ি একসময় বর্ষায় নৌকা যোগে না হয় প্রধান পিচঢালা রাস্তা হতে বা পাকুল্ল্যা নামক শহর কেন্দ্রীক গ্রাম হতে পায়ে হেঁটে কাটরাতে যেতে হতো। পরে চলাচলের দুর্দশা বা ছেলে মেয়ে মানুষ করার লক্ষ্যে তায়েবের বাবা পাকুল্যা গুনটিয়ার মাঝামাঝি পাকুল্যার শেষ সীমাতে বাড়ি করে। তবে উভয় বাড়িই সমান হারে বসবাস করেন। এই সব অগ্রপথে নেওয়ার পিছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তায়েবের মা। যদিও তায়েবের বাবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসাবে একাধিক বার নির্বাচন করেছিলেন কিন্তু প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে জয়ী হতে পারেন না। বাবা ডিএ গণি এমনি একজন মানুষ ছিলেন যে নিজের সম্পদ বিক্রয় করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের পিছনে অর্থ ব্যয় করেছেন। কত ছেলে মেয়েদের আর্থিক সহযোগিতা করে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলেছেন তার ইয়াত্তা নেই। ঠিক তিনার চেয়ে বেশি ছিলো তায়েবের মা। মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে না খাওয়া মানুষের পাশে গিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তা ঐ সকল এলাকাতে মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখনো এবং চিরকাল থাকবে। কাটরা বা পাকুল্যাতে কথা উঠলেই গণি সাহেবের পরিবার বা তায়েবের মার কথা উঠে। তাতে পরিচয় নিলে একদিকে দানশীল দানবীর বাবা অন্যদিকে মা। তদ্রূপ তাদের সন্তান গণও মা-বাবার চেয়ে কম নয়। আমার সাথে তায়েবের পরিবারের নাসির ভাই, কাদের, তায়েব এবং মতিন এই চারজন ভাইয়ের সাথে কম বেশি পরিচয়। তন্মধ্যে কাদের তাদের মধ্যে মেজো ভাই আমার পড়ালেখার সঙ্গী এবং বন্ধু। শুধু বন্ধু নয় খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাঝে মধ্যে কাদেরদের গাঁয়ের বাড়ি

আমার যাতায়াত হতো এবং আমার বাড়ি কাদেরও আসতো। অনেক সময় হতো পাকুল্যা মাঠে ফুটবল খেলা শেষে আমার সাথে আমার বাড়ি থাকা হতো। অবশ্য তখন ওদের পাকুল্যা বাড়ি হয় নাই। তদ্রূপ তায়েবের বড় নাসির ভাই আমার বড় ভাই সেলু, চান মিয়া, পাপন, মৃদুল এদের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তার মধ্যে ফজল ভাই-এর পরে পাকুল্যা পূর্ব পাড়ার চুন্নু ভাই-এর সাথে এদের সকলের বন্ধুত্ব ছিলো অটুট যা এরা একত্রে পাকুল্যা বাজারে গেলে গমগম করতো। মানুষ আশ্চর্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। এদের মধ্যে কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছে কেউ মুক্তিবাহিনীতে সংগঠক হিসেবে নিয়োজিত ছিলো। তারপর কালের বিবর্তনে পেটের তাগিদের সুবাদে যার যার চাকরিতে চলে গেলো নাসির ও ফজল ভাই গেলেন পুলিশের সার্জেন্ট হয়ে, সেলু গেলো প্রথমে কনজোমার ডিপার্টমেন্টে পরে বন্ধ হলে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, চান মিয়া জুট কর্পোরেশনে, পাপন বিজি প্রেসে, চুন্নু ভাই গেলেন লঞ্চ ডিপার্টমেন্টে, আসলে যার কথা বলার জন্য আমার এই লেখা তিনি হলেন রত্নগর্ভা মমতাময়ী মহিয়সী মা সুফিয়া গণী সংসারে অবদানের শেষ নেই। তেমনি একজন অলংকৃতের বাতিঘর প্রজ্বলিত আলোর কিরণ মা। মা বলতে যে সর্বদাই পাগল তারই মুখ হতে মায়ের কথা মনোযোগ দিয়ে মগ্ন হয়ে শুনছিলাম। তার যে মা হারাবার ব্যথা তাকে হারিয়ে মনে হলো তার স্বর্গ তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে। চোখে অশ্রুসিক্ত নয়নে গলা ভিজা শব্দ চয়ন করা কণ্ঠে কষ্ট হতেছিলো তা বলতে। তার চোখের ভাষা, অনুভূতি শুনেই অনুমান করতে পেরেছি যে তার মা'র জন্য গঙ্গা যমুনা পদ্মার স্রোত বাধার মতো বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলছে। মা না থাকার হাহাকারের নিঃশ্বাস। যেমন গঙ্গার জল শুকিয়ে উর্বর জমির মাঠ ফেটে কান্নার আওয়াজের মাঝে খুঁজে খুঁজে হৃদয় বলে মা তুমি কোথায়, কোথায় তুমি? আমাদের নিঃসঙ্গ জীবনহীন মরুভূমিতে ফেলে চলে গেলে আর রেখে গেলে তোমার গড়া ছেলের রাজপ্রাসাদ। ভেবেছিলাম তুমি থাকবে এই রাজ প্রাসাদে চিরদিন রাজরানী হয়ে। তবু শুধু দিয়ে গেলে নিলে না চলে গেলে সব রেখে অন্যখানে। যা কিছু দেবার তা তুমি আমাদের মাঝে নিঃশ্বাসহীন ভাবে সব দিয়ে শেষ সন্ধ্যার পথ বেছে নিলে। আমার এখন এই রাজপ্রাসাদ তুমি বিনে অন্ধকার আচ্ছন্ন, এখন মনে হয় ঘর এ বাড়ি নির্মাণ না করলেই হয়তো ভালো হতো, যেখানে আমার মা বসবাস করতে গিয়েও বসবাস করা হলো না। এই আক্ষেপের মধ্য দিয়ে অন্তরের কথা বেরিয়ে এলো ডিএ তায়েবের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এলো মা ছিলো সর্বগুণে গুণান্বিত। যেখানে হাত ছোঁয়াতেন সেখানে সোনা ফলাতেন। যেমন; চার পুত্র সন্তান একজন সার্জেন্ট, একজন নাম করা ব্যবসায়ী, একজন পুলিশের বড় কর্মকর্তা ও স্বনামধন্য চলচ্চিত্র বা টেলিভিশনের সেরা প্রতিষ্ঠিত নায়ক। যার সুনাম নায়ক রাজ রাজ্জাকের সমতুল্য না হলেও কাছাকাছি তবুও সে নিজেকে একজন হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাজে ক্ষুদ্রতম বলে দাবী করেন। তার ভিতর পরিষ্কার মন পরিষ্কার চলনে বলনে অমায়িক একজন ভদ্র রুচি সম্পন্ন মানুষ। যার ভিতরে কোনো অহংকার হিংসা বিন্দুমাত্র নেই আছে শুধু নিজেকে উজাড় করে বিলিয়ে দেবার মন মানসিকতা। তবে তার সহধর্মিণী জনাবা মাহবুবা শাহরীন একজন সমাজ চেতনায় বিশ্বাস করে। তাই সে সমাজের উন্নত করার মন নিয়ে মির্জাপুর উপজেলায় সর্বকনিষ্ঠ হয়েও জনমত জরিপে প্রথম স্থান (৫৬,০০০ হাজার ভোট পেয়ে) অধিকার করেন এবং মির্জাপুর জেলায় মহিলা আসনে ভাইস চেয়ারম্যন পদে আসীন হয়। সে একজন সহজ সরল মনের মানুষ সবচেয়ে বড় কথা মানুষের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়াতে জানে। যেমন তার স্বামী ডিএ তায়েব। অর্থাৎ একই তরঙ্গে দুধারার মানুষই হয় না। এক সঙ্গে একই সুরে গান গাওয়া একই সাথে একই কথা বলা। ব্যবহার ভালোবাসা স্নেহ শ্রদ্ধাবোধ একই। ফলে সাংসারিক জীবনে স্বামী স্ত্রী অত্যন্ত সুখী দম্পতি। তাদের একটি মেয়ে একটি ছেলে রয়েছে তাদেরকে বলতে হয় মা বাবা কা সন্তান সিপাইকা ঘোড়া চলনে বলনে বাবা মার অনুরূপ মিশুক অমাইক ব্যবহার অতিথি আতিথেয়তা আপ্যায়নে মা বাবার চেয়ে আরও এক ভাগ এগিয়ে এবং কুশলাদী বিনিময়ের জুড়ি নেই। ছেলের নাম ইমতিয়াজ তায়েব আর মেয়ে দেওয়ানজাদী তাজরেমিন তানহা টুনটুনি, তাদের ছেলের নামের সাথে কথার অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা মা বাবার মত হাসি ব্যতীত কোন কথা নেই। তারা মা বাবার মত সহজে সকলকে আপন করে নিতে পারে। যার বাবা মা এতটা ভালো অবশ্য তার সন্তানেরা তাদের সমতুল্য থাকাটাই স্বাভাবিক। ডিএ তায়েবের ছোট ভাইয়ের ডাক নাম ডি.এ মতিন। সকলে মতিন বলেই চেনে। সে মির্জাপুর উপজেলার অন্তর্গত জামুর্কী ২নং ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান সেও নাসির ভাই, কাদের, ডিএ তায়েব এদের চেয়ে আচার আচরণে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে কম নয়। সর্বদাই হাস্যোজ্জ্বল মাখা চেহারাতে থাকে এবং ইউনিয়নের লোকগুলিকে প্রয়োজনীয়তা চাহিদা, প্রাপ্তিতা মিষ্টি মধুর ভাবে সমাধান করে বিদায় করেন অথবা প্রয়োজনের খাতিরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের কথা শুনেন। আসলে একদিকে বিচার বিশ্লেষণ করলে মতিনের মত চেয়ারম্যান ২নং জামুর্কী ইউনিয়নে ইতোপূর্বে দ্বিতীয় কেউ আসে নাই। এখন মানুষের মুখে মুখে মতিনের মত চেয়ারম্যানের এই ইউনিয়নে দরকার। যাই হোক সেদিনটি শুক্রবার আনুমানিক সকাল ১১টাতে আমি আর ছায়ানীড়ের

পরিচালক জনাব লুৎফর রহমান গিয়েছিলাম সুনামধন্য জনপ্রিয় অভিনতা ডিএ তায়েবের নতুন বাসায়, দরজায় বেল টিপতেই ডিএ তায়েব নিজেই দরজা খুলে দিয়ে সম্মানীয়ভাবে নিয়ে সোফাতে বসালেন। ও আমার বন্ধুর ছোট ভাই তাছাড়া ছোট কাল হতে ওদের পরিবারের সাথে ওদের সাথে সে এক অন্যরকম সম্পর্ক যা পূর্বেই জানানো হয়েছে। নতুন বাসায় এক মনোরম দৃশ্য স্পষ্টই ফুটে উঠেছে যা দেখে এবং আমি লুৎফর সাহেব আশ্চার্য যে প্রতিটি ঝারবাতি এক একটি অনন্য রূপে সুসজ্জিত। অনেক কথা হলো প্রচুর পরিমাণ নাস্তা পরিবেশন করলো ওর স্ত্রী মাহবুবা শাহরীন। তারপর ঘুরে ঘুরে বাড়ির কোণায় কোণায় দেখায়ে বসলাম ওর নিজের বেডরুমে। বসে মায়ের ছবি দেখতে দেখতে অঝর ধারায় অশ্রু ঝরছে আর কেঁদে কেঁদে মায়ের স্মৃতি রোমন্থন করছে। মাকে এতটায় ভালোবাসে তায়েব যে তিনি যে কক্ষে বসবাস করতেন তা আদৌ তার মৃত্যুর পর কাউকে তাহার কক্ষে থাকার অনুমতি নেই হয় নাই। মা যে অবস্থাতে রেখে গেছেন তা দীর্ঘদিন পরও সে অবস্থাতে রয়ে গেছে তায়েবের ছেলে মেয়ে তাদেরকেও না অবশ্য প্রত্যেকের কক্ষ আলাদা আলাদা এবং মার্জিত ভাবে পরিপাটি করে গোছানো। যতক্ষণ ছিলাম মায়ের স্মৃতি বার বার ঘুরে ফিরে কথার ফাকে ফাকে আসছিলো, আসলে মা তো মা-ই হয় মা'র বিকল্প দ্বিতীয় কেউ হয় না। তাই তাকে স্নেহময়ী মা বলে। মা সন্তানের কাছে থাকে বলে বাবার কথা কম বলা হয়। কিন্তু বাবারও যে অবদান আছে তা ভোলার মতো নয়। বাবা তার জীবন যৌবন পার করে সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ করার পথে অগ্রদূত হয়ে পাশে থেকে যার পদচারণা থাকে নিঃশব্দে অববাহিকার নদীর স্রোতের মত। বাবা যেমন কিছু পাওয়ার আশায় সন্তানদের পিছনে শ্রম বা নিজের দেহ ক্ষয় করে না তদ্রূপ মাতো আরও বেশী কাছে থেকে পাশে থেকে নিজেকে উজার করে বিলিয়ে শেষমেষ জীবন শায়নে মাটির গহ্বরে সর্বশেষ ক্ষয় হতে হতে একদিন শেষ আশ্রয়ের পথে শেষ ঠিকানায় চলে যায়। যেমন ডিএ তায়েবের মা তদুপরি আমার সকলের মায়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ। তায়েবের অন্তর গহনে যেমন মায়ের জন্য মা না থাকার জন্য রক্ত খনন হয়েছে, আমারও তা তার চেয়ে কম নয় মায়ের জন্য। মায়ের চলন বলনের কথা শুনে শক্ত ভাবে মনের অন্তরালে ফুপিয়ে ফুপিয়ে হৃদয়ে আঘাত করতে ছিলো। এক সময় তায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় মুখ মণ্ডল লাল গোপনে অশ্রু মুছে নেওয়া কৌশল প্রস্ফুটিত হয়ে দোলনার ন্যায় দোলন খেতে খেতে চঞ্চল হয়ে উঠে। কোথায় আছে না আছে মায়ের মত হয় বল ক'জনা, তায়েবের সিমসাম পরিবার দেখে ভালই লাগলো। শুধু অভাব মায়ের। যা সারা জীবন থাকবে না আবার আমরা যখন এ পৃথিবী দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবো সেদিন আমাদের অভাবও ছেলে মেয়েদের মধ্যে থাকবে এটা চিরচরিত নিয়ম। এভাবে চলবে আবহমান কাল ধরে নদীর কূল ভাঙ্গা শব্দের মত। তায়েবের আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় সব চেয়ে বড় গুণ পরিলক্ষিত হয়েছে যে সে সকলকে নিয়ে আপন করে নিজের কাছে রেখে নিজের হৃদয়ে ধারণ করে পথ চলতে চায়। একা থাকার চিন্তা ভাবনা মন মানসিকতা একেবারে অনুপস্থিত যা হতো মায়ের গুণের কাছে পাওয়া। আসলে এক একটা সন্তানের চরিত্র একেক রকম হয়। কেউ মাকে কাছে রেখে মায়ের সান্নিধ্য পাওয়ার প্রত্যাশায় মায়ের সঙ্গ, মায়ের শাড়ির আঁচলে থেকে তার কোলে মাথা রেখে ঘুম পাড়ানি গান শোনা আবার মাকে সকাল বিকাল কাজের ফাঁকে দেখা তার ভালোবাসা স্নেহ আদর নিংড়ে আদায় করে নেওয়া একেকজনের চাওয়া পাওয়ার ধরন ভিন্ন। মাকে ভালোবাসে না এমন কেউ নেই বলে আমার জানা নেই। তবে যে একেবারে নেই তা কিন্তু না অনেক ছেলে মেয়ে আছে জন্মের পর বেড়ে উঠার সাথে সাথে মাকে ভুলতেই থাকে। যেন মা বলতে কেউ আছে তা তাদের মনেই নেই। মনে হয় ঐ সন্তানেরা একাই দুনিয়াতে পা রেখেছে একা একাই পথ চলছে এতে করে মায়ের অবদান তাদের মধ্যে ছিটেফুটো নেই। এরা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতক মুখ মুছা শয়তান এদের কালের বিবর্তনে মেহমানের খাতায় নাম লেখা হয়ে থাকে। যারা এই প্রকৃতির বন্ধনে চলাফেরা তারা মনে করে না যে চলার পথে সাহায্যকারী হিসাবে সবাই চলে যেতে পারে কিন্তু মা সন্তানকে কোল হতে রেখে চলতে পারে না। এ রকম মা আমার নজরে খুব কম চোখে এসেছে। তাই বলছিলাম তায়েবের যেমন মায়ের প্রতি পাগলের মত ভালোবাসা তেমনি প্রত্যেক সন্তানের উচিত (সে ছেলে হোক কিংবা মেয়ে) তার মতো মাকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা, মাকে কাছে রাখা মায়ের চাওয়া পাওয়া, মায়ের সাধ আহ্লাদ আবদার পরিপূর্ণভাবে পূরণ করা। যেমন একদিন মা আমাদের জন্য ঐ সকল আবদার পূরণ করেছে। তায়েবের কথার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে যে, তায়েব দৃষ্টিকোণ হতে তার মা সেরা পৃথিবীর সবার তুলনায়। তার স্ত্রীর মুখে শাশুড়ি মার কথা শুনলাম মা অত্যন্ত একজন ভালো মানুষ। তার সন্তানের কাছেও তার দাদী মা একজন প্রিয়দাদী মা। এই যে পারিবারিক বন্ধন তা ডিএ তায়েবের মত সকল পরিবারের থাকা উচিত বলে মনে করি।

তারপর তার বাসা হতে বিদায়ের আগে চা পর্ব চায়ে চুমুক দিতে দিতে তায়েবকে প্রশ্ন করা হলো আচ্ছা তোমার মা তোমাদের কি কখনও নামাজ পড়ার তাগিদ করেনি? একটু হেসে তায়েব বলে, কি যে বলেন ভাই মা তাহাজ্জুতের, এশরাকের, চাশতের সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন।

সেই সাথে আমাদের ভাই বোনদের পড়তে হতো। নামাজ না পড়লে হয়তো সেদিন খাওয়া দাওয়া বন্ধ হতো। আমাদের পারিবারিক অনুশাসনে সবার চেয়ে আলাদা ভাবে মানুষ হতে হয়েছে একদিকে বলতে গেলে রেসপেক্টিভ ফ্যামিলি। তাছাড়া পূর্ব পুরুষের দেওয়া মসজিদ মাদ্রাসার ধর্মীয় শিক্ষা নিতে হতো। মক্তবে উপস্থিত হলাম কি না তা মা বাড়ির কাজের লোক পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। তাছাড়া ঠিক সময় প্রাইমারি, স্কুল, কলেজে কোন প্রকার পড়া লেখাতে ফাকি দিচ্ছি কি না তারও সংবাদ মায়ের কানে পৌঁছে যেতো এমন কি সারাদিন সাংসারিক কাজ কর্ম সেরে সন্ধ্যায় হারিকেনের আলোতে বসে মা মাঝে মধ্যে আমাদের ভাইবোনকে পড়াতেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতেন। বলতে দ্বিধা নেই আমার মা আমাদের কাছে একজন আদর্শ মা হিসাবে পরিলক্ষিত হয়। আজ মায়ের আদর্শ, অনুশাসন তার তদারকির কারণে আমরা ভাই বোন একেকজন এতো বড় বড় স্থানে অবস্থান করছি। এই মুহূর্তে মা নেই তাই তাহার অভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পলে পলে অনুভব করছি। আর মনে মনে অনুভব করি আমাদের মা আমাদের মাঝে আর কিছু দিন কেন রয়ে গেলেন না। এখনও মনে হয় তার থাকার কক্ষের সামনে দিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করার মুখে মা বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে অথবা কক্ষের ভিতর হতে আমার নাম ধরে ডাকছে তায়েব তায়েব বলে, ডাকছে আমার স্ত্রী সন্তানদের। তখন আর কিছু ভালো লাগে না তখন নিজের কক্ষে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে অবশ্য মাঝে মধ্যে কেঁদে মনকে হালকা করে নেই। না হয় ছেলে মেয়ে স্ত্রী মাহবুবা শাহরীন এসে সান্ত্বনা জোগায়। আমার জীবনে আরেকটি অধ্যায় তাহলো আমার স্ত্রী শাহরীন সে আমাকে সম্পূর্ণ বুঝে এবং সকল বিষয়ে পাশে থেকে সহযোগিতা করে এবং অনুপ্রেরণা পথ বাতলে দেই। তদ্রূপ ছেলে মেয়েগুলিও তাই। আমি তায়েবের কর্মজীবনে যেমন সাফল্য পেয়েছি চলচ্চিত্র জীবনেও তাই এবং সাংসারিক জীবনে তো কথাই নেই। আসলে এক হাতে তালি বাজে না দুহাতেই তালি বাজাতে হয়। আমার জীবনে মা হারাবার আগে পরে দুই দুই চার মানে আটহাত তালি বাজার লোক পেয়ে গেছি। ওরা অনেক বুদ্ধিমান আমার অনেক পুরস্কার, চলচ্চিত্র কর্মস্থলের টিভি নাটকের পুরস্কার শোকেসে বন্দী। মাকে দেখতাম মাঝে মধ্যে নিজেই তা ধুলাবালি পরিষ্কার করে পুনরায় শোকেসের মধ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতেন, দেখতেন আর বলতেন আর কত দিনই বা তায়েবের এসকল পুরস্কার দেখতে পারবো। এসব কথা মার মুখে শুনে কোন সন্তান কি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আপনারা বলুন। তবুও আমার স্ত্রী, আমার সন্তানদ্বয় আমি বলতাম এসব কি তুমি আবোলতাবোল বলছো মা। তোমাকে কোথাও যেতে দিলে তো? তোমাকে আরও দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু না একদিন সবার অলক্ষ্যে আমার অলক্ষ্যে পাড়ি জমালো উপরের যাত্রী হয়ে। আর পারিনি ধরে রাখতে সেদিনের সেই মার কথাই সত্যি হলো আর কতদিন তায়েবের পুরস্কারগুলি দেখে রাখতে পারবো।

কথাগুলি মনের অজান্তে আমার এবং আমার সহ সাথী ছায়ানীড়ের পরিচালক লুৎফর ভাইয়ের কাছে তায়েব এর মায়ের বর্ণনায় বলতে ছিলেন। সেদিন আমি মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম যদি তায়েবের কথা তুলে ধরা যায় লিখিত আকারে হয়তো তাঁর মার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হবে। এভাবে একজন বর্তমান যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক আমাদের সময় দিতে পেরেছে সেজন্য তাকে এবং তার পরিবারকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন তথ্য জেনে আমার লেখনীতে তুলে ধরতে পারি সেজন্য সহযোগিতা কামনা করি। তারপর আরেকটা কথা বলতে চাই যেমন তায়েবের মা বাবা চিরকাল বেঁচে নেই তেমনি আমার আপনার মা বাবা হয়তো তায়েবের মা বাবার মতো কেউ কেউ আগে পরে চলে গেছে আবার যাদের মা বাবা বেঁচে আছেন তাদের জন্য দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করবেন। তাছাড়া পরিশেষে একটা কথা বলবো একদিন এ পৃথিবী এ আলো বাতাস, মায়া মমতা, প্রিয় বন্ধনগুলি ছেড়ে আমার আপনার সকলে ঐ চলে যেতে হবে কেউ চিরস্থায়ী নয়। তাই এভাবে চলবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুধু স্মৃতির পাতায় পাতায় বহন করে থাকবে। শুধু একটা কথা বলে যে চাই সন্তানের কাছে মা যেমন শত্রু নয় তেমন মায়ের কাছে সন্তান শত্রু হয় না। তাই বলবো মাকে সম্মানিতভাবে লালন করে দেখবে, দেখবে শান্তির ফোয়ারা জোয়ারের মত উতলে উপচে পড়ছে। মায়ের দোয়াই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দোয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য আর আল্লাহ তালার রহমত পাওয়ার জন্য সকল দরজা খুলে দেবার মাধ্যম। সেই জন্য তায়েবের মত আমার আপনার সকলের হওয়া উচিত 'মা আমার পৃথিবী'।